জাতীয় আন্দোলনে
রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা

আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—২৫ বৈশাখ, ১৩৫২

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৪

[এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডারে প্রদত্ত হইয়াছে।]

মূল্য দুই টাকা

ভূমিকা

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকসঙ্ঘ "রবিবাসর"-এর দুইটী অধিবেশনে "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" নামে আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতাগুলি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখন বন্ধুদের অনুরোধে ঐগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বিরাট ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা দিক দিয়া বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় জীবনের উপরেও তাঁহার প্রভাব অসামান্য। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্যশিষ্য ও ভক্তেরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই "রাজনৈতিক" দিকটা লইয়া তেমন আলোচনা করেন না, ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বমানবের পূজারী বলিয়া গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু তিনি যে সর্বাগ্রে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন, একথা স্বীকার করিতে যেন লজ্জাবোধ করেন।

অথচ আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র,—তাঁহার সমস্ত কবিত্বের উৎস ছিল এই স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম, বাল্যকাল হইতেই জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই দিকটা লইয়াই আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার অসাধারণ কবিপ্রতিভা বা তাঁহার সৃষ্ট অতুলনীয় সাহিত্যের মূল্য বিচার করিতে চেষ্টা করি নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয় আধুনিক জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। এই অভ্যুদয়ের মূলে কোন কোন প্রবল শক্তি কার্য করিয়াছিল, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হইবে বলিয়া আশা করি। কিন্তু বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় পীড়িত জাতির অন্তঃস্থল হইতে স্বাধীনতা ও জাতীয় সমুন্নতির একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা যে এই যুগে জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহাই যে জাতিকে তাহার লক্ষ্যপথে দুর্নিবার আকর্ষণে পরিচালিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু মনীষী ও শক্তিশালী ব্যক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইযাছিলেন এবং তাঁহাদেরই সুদীর্ঘ তপস্যার ফলে বাঙলায় জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সব শক্তিশালী মনীষী-দেরই অন্যতম এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাঁহার তপস্যার দানও অসামান্য। ইহা তাঁহার জীবনের একটা গৌরবোজ্জ্বল অংশ। যাঁহারা এই দানকে ছোট করিয়া দেখিতে চাহেন, স্বজাতির ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হয় নাই। উহার গভীর মর্ম তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিব। এই কারণেই, বাঙলার জাতীয় আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনকে এই সব স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিরা "বুর্জোয়া আন্দোলন" বা "পাতি বুর্জোয়া আন্দোলন" ইত্যাদি অদ্ভুত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কত বড় একটা বিরাট আদর্শ ঐ জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না, বা দেখিবার চেষ্টা করেন না।

পরাধীন জাতির জীবনে 'ভাব দাসত্ব' একটা ব্যাধিবিশেষ। এক সময়ে পাশ্চাত্য সংশয়বাদ ও প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতি আমাদের শিক্ষিত

সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল। এখন আবার "মার্ক্সবাদ" আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের নিকট উহাই জ্ঞানরাজ্যের শেষ কথা,—সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি—সব কিছুই এই একমাত্র কষ্টি পাথরে ঘষিয়াই তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যত কিছু সুন্দর বা মহৎ জিনিষই হউক না কেন, এই বিচারে না টিকিলে তাহার কোন মূল্যই তাঁহারা স্বীকার করেন না। "মার্ক্সবাদ" অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব সন্দেহ নাই। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে মার্ক্সের অতুলনীয় দানের মূল্যও কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু দেশকালপাত্র-নির্বিচারে উহাই মানবসভ্যতা তথা রাষ্ট্র ও সমাজের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ বা তাহার মূল্য নির্ধারণ করিবার একমাত্র মাপকাঠি, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মার্ক্স মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির মূলে অর্থনৈতিক কারণকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, এমন কি অনেকস্থলে উহাকেই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কালের বহু মনীষী একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা মানবসভ্যতা বা মানব-সমাজের অভিব্যক্তির মূলে অন্যান্য প্রবল শক্তির ক্রিয়াও লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেম, সৌন্দর্য, দুর্জ্ঞেয় বিশ্বরহস্যের মূল অনুসন্ধানের দুর্নিবার প্রবৃত্তি, স্বাধীনতার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—এই সমস্তই মানব-সমাজের অভিব্যক্তির মূলে কার্য করিয়াছে, মানবসভ্যতার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এগুলিকে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণের হামামদিস্তায় ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া সর্বরোগহর মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নহে। ইউরোপে গ্রীক বা রোমক সভ্যতার অভিব্যক্তি, পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব,—অন্যদিকে ভারতে আর্য্যসভ্যতা ও বৌদ্ধসভ্যতার বিকাশ, আরব সভ্যতার অভ্যুদয়, এ সকলের মূলে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া কি আর কিছুই ছিল না?

ভারতে মধ্য যুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলন, বাঙলা দেশের পাল ও সেন যুগের সভ্যতা, যোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস—উহাদের মূলেও নিশ্চয়ই অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া ছিল।

বাঙলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় অভ্যুদয়ের আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার মূলেও তেমনি বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ আন্দোলনে জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকেই সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি—সকল ক্ষেত্রেই একটা নবজাগরণ আসিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাহারই একটা অভিব্যক্তি; কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাকে কেবল মাত্র "বুর্জোয়া আন্দোলন" বা "পাতি বুর্জোয়া আন্দোলন" বা চাকুরী-প্রার্থীদের বিক্ষোভের ফল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা মূঢ় ভাবদাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে যাঁহারা 'বুর্জোয়া' বা "পাতি বুর্জোয়া" মনোভাব ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না, তাঁহারা নিতান্তই করুণার পাত্র।

এইরূপ ভাবদাসত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই জাতীয় ভাব বা স্বাদেশিকতাকে ক্ষুদ্র জিনিষ বলিয়া মনে করেন, স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রেমও ইঁহাদের নিকট বড় কথা নহে। বিশ্বের "সর্বহারাদের" মুক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত জিনিষকেই ইঁহারা তুচ্ছ মনে করেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, ইঁহাদের পীঠস্থান মস্কো এবং মহাগুরু ষ্ট্যালিন ইঁহাদিগকে লজ্জা দিয়াছেন। এই মহাযুদ্ধে মহাবীর ষ্ট্যালিন স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাকেই বড় আদর্শ বলিয়া ধরিয়াছেন, রুশজাতি তাই ফাদারল্যাণ্ড বা পিতৃভূমি রাশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতেছে, বিশ্বের সমস্ত নিঃস্ব সর্বহারাদের মুক্তির জন্য নহে। তাই আমাদের মনে আশা

জাগিয়াছে, বাঙলা তথা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকেও হয়ত আধুনিক পণ্ডিতেরা আর একটু বড় করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিবেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি যে তুচ্ছ জিনিষ নয়, ইহাও হয়ত ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এবং তাহা হইলেই বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান যে কত মহৎ সে-কথাও তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্বপ্রেম, সর্বমানবপ্রীতি এ সমস্তই খুব বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি যাহাদের নাই, তাহারা বিশ্বপ্রেম বা সর্বমানবপ্রীতির মূল্য বুঝিবে কিরূপে? যাহারা পরাধীন, দেশকে স্বাধীন করিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে বিশ্বপ্রেম, নিখিল ভুবনের সর্বহারাদের দুঃখমোচনের কথা মুখে আনিবার কোন অধিকার নাই। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আজ আমাদের তরুণদের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির কোন অভিব্যক্তি দেখিতে পাই না; ইহারা যে পরাধীন দেশ ও পরাধীন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরবশতার গ্লানি ও বেদনা ইহাদের মর্মে তপ্ত-শেলের মত বিঁধিতেছে, এমন কোন লক্ষণের প্রকাশ নাই, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও কোন "সাম্প্রতিক" কবি বা সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে দূরবীক্ষণ লাগাইয়াও খুঁজিয়া পাই না। তৎপরিবর্তে একটা অবাস্তব আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, আধুনিক কবিতার নামে কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দসমষ্টি বাঙলা সাহিত্যকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে; 'সন্ধ্যা ভাষায়' রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মতই এগুলি সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর অস্পষ্ট হেঁয়ালী বা প্রহেলিকা মাত্র। আধুনিক বা সাম্প্রতিক কবি ও সাহিত্যিকেরা এগুলিকে "নবযুগের ভাবধারার অভিব্যক্তি" বলিয়া যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুন

বা আত্মপ্রবঞ্চনা করুন, আমরা এই সাহিত্যকে বাঙালীর জাতীয় মনের অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। ইহার পশ্চাতে কোন বড় ভাব বা আদর্শের প্রেরণা নাই।

গত শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হইয়াছিল, সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহা সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল; পক্ষান্তরে সেই আন্দোলন সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যও যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ একাধারে সেই জাতীয় ভাবধারার উত্তরাধিকারী এবং স্বয়ং বহুল পরিমাণে উহার স্রষ্টা। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী এবং তাঁহার সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনকে না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝা যায় না, আবার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যকে না বুঝিলে বাঙলার জাতীয় আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনকেও সম্যক বুঝা যায় না। বর্তমান গ্রন্থে আমরা সেই দিক দিয়াই বাঙলার জাতীয় আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর সফলকাম হইয়াছি, পাঠকদের উপরেই তাহার বিচারের ভার।

প্রকাশকের নিবেদন

আজ রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মদিনে গ্রন্থখানি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। বর্তমানের আদর্শ-বিমূঢ়তার দিনে গ্রন্থখানি যদি দেশবাসীর বিভ্রান্তি দূরীকরণে কিছু পরিমাণেও সহায়তা করে, তাহা হইলে এই আয়োজন সার্থক হইবে। গ্রন্থকার তাঁহার জীবিত কালেই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ১৩৫১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবেন। কিন্তু ১৩৫০ সনের চৈত্রসংক্রান্তির দিন তিনি পরলোকগমন করাতে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরও চেষ্টা করিলে গত বৎসর রবীন্দ্রজন্মদিনে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা যে সম্ভব না হইত তাহা নহে। কিন্তু সদ্য শোকচ্ছায়ার পরিবেশে তাহা করা সমীচীন বলিয়া মনে করি নাই। রবীন্দ্রজন্মদিনে গ্রন্থপ্রকাশের যে সংকল্প গ্রন্থকারের ছিল, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্যই তাহার পরেও গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হয় নাই। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে গ্রন্থখানি যেরূপ নির্ভুল ও সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হইত তাঁহার অভাবে যে তাহা সম্ভব হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তথাপি আমার যথাশক্তি ইহাকে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও যে ভুলভ্রান্তি থাকা সম্ভব সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। সহৃদয় পাঠকগণ যদি ভ্রমসংশোধনে সহযোগিতা করেন তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব।

গ্রন্থকারের ইচ্ছা ছিল, গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ইহা মহাকবির স্মৃতির উদ্দেশেই সমর্পিত হইল।

২৫ বৈশাখ, ১৩৫২

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

সূচী

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ

কৈশোরের স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই। তবে জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে মহৎ লোকের কথা শুনিলে মনে আনন্দ হয়। আমি পুরাতন কথাই বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অনেক কথাই মনে উদিত হয়। কারণ জীবিতকালে তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। একটি প্রবন্ধে তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে চেষ্টা আমি করিব না। আমি শুধু তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার মহৎ দানের দিগ্‌দর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে আধুনিক বাঙলার "সুবর্ণ যুগ" বলা যায়। এই রকম সময় বাঙলা দেশে খুব কমই দেখা গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে নব-জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যে সময় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তখন সমস্ত দিক দিয়াই বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনে একটা মহৎ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে সিপাহী-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে বহির্জগতের প্রভাব এই জাগরণের মূলে অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইটালী বহুকাল পরে অস্ট্রিয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়েই আমেরিকার ক্রীতদাসেরা মানবকল্যাণকামীদের আন্দোলনের ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং ক্রীতদাসপ্রথা চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছিল। বহির্জগতের এই সব আন্দোলনের তরঙ্গ বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের উপর আসিয়া প্রবলভাবে আঘাত করিয়াছিল। তাহার ফলে সাহিত্যের বিকাশ, জাতীয়তার আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন—জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকেই তখন জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙলা দেশ সমস্ত ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং সকল দিকেই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। একথা আমরা গর্ব করিয়া বলিতেছি না। ইহা খাঁটি সত্য কথা এবং কিছুদিন পূর্বেও সকলেই স্বীকার করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে কেহ কেহ উহাকে আমাদের বৃথা-গর্ব বলিয়া মনে করেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সিমলা-শৈলে একটি সভায় অন্যতম কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর হইতে ভারতবর্ষে সত্যকার স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্ভব হয়।" তৎপূর্বে বাঙলা দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন হইয়াছে অথবা বাঙলা সাহিত্যে কেহ যে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুক্ত

ভুলাভাই দেশাই-এর মত একজন ভারতবিখ্যাত নেতার যে এইরূপ অজ্ঞতা থাকিতে ও ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙলা সাহিত্যকে প্লাবিত করিয়াছিল। তখনকার অনেক বিশ্রুত-কীর্তি কবি, মনীষী ও সাহিত্যিক বাঙলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

সিপাহী-যুদ্ধের পর দেশে যে একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, বাঙলা দেশের কবি ও সাহিত্যিকদের মনেই তাহা সর্বপ্রথম প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ' কেবল মিত্রাক্ষর ছন্দের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহের পরিচয় দেয় নাই, ঐ কাব্যের আগাগোড়া স্বাধীনতার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই সময়েই কবি রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনী' কাব্যে তূর্যধ্বনি করিয়াছেন,—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।

* * * *

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় রে,
স্বর্গসুখ তায়।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এই সময়েই বিদেশী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে বিদ্রোহধ্বনি তুলিয়াছিল।

এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন,—তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সে পরিবারে পূর্ব হইতে স্বদেশী ও জাতীয় ভাব প্রবল ছিল। তাঁহার পিতা ও সহোদরগণ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্রুতকীর্তি পুরুষদের দানে জাতীয় জীবনের নানা দিক পুষ্ট হইয়াছে। বিশেষত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যে স্বদেশী ভাব প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে "হিন্দু মেলা"র সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের জন্মের ১৮ বৎসর পূর্বে ১৮৬৭ সালে "হিন্দু মেলা"র সূচনা। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর এই মেলা হইত। তখনকার দিনে দেশের যত জ্ঞানী, গুণী, চিন্তানায়ক, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই "হিন্দু মেলা"য় যোগ দিয়াছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি মনোমোহন বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি।

জাতীয় ভাবের বক্তৃতা, জাতীয় সংগীত প্রভৃতির দ্বারা এই

হিন্দু মেলায় দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন করিবার চেষ্টা হইত। স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারের আয়োজনও এই মেলাতেই সর্বপ্রথম হইয়াছিল। হিন্দু মেলায় যে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। প্রথমত, হিন্দু মেলার উদ্যোক্তারা অখণ্ড ভারত ও এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন, কেবল বাঙলা ও বাঙালীর কথা ভাবেন নাই। ইহার পূর্বে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কেহ অখণ্ড ভারত ও ভারতীয় মহাজাতির কথা বলেন নাই। এ গৌরব বাঙলারই প্রাপ্য এবং হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের নিকটই সমগ্র দেশ এজন্য ঋণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে এবং অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া'তে একথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, কংগ্রেসই 'ভারতীয় মহাজাতি'র কথা প্রথম বলিয়াছেন, তাঁহারা ভুল বলেন, কংগ্রেসের পূর্ববর্তী বাঙলার আর একটি প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'ও এই ভাব প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও হিন্দু মেলার পরে এবং 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যে হিন্দু মেলার নিকট হইতেই এই ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু মেলা প্রবর্তনের ৯ বৎসর পরে ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়ে-শন'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। (শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' দ্রষ্টব্য)।

হিন্দু মেলার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার অনুষ্ঠাতারা 'আত্মশক্তি'র বলেই দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, আবেদন-নিবেদনের পথে নয়।

তৃতীয়ত, দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে যে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়োজন, হিন্দু মেলায় এই ভাবও সর্বাগ্রে হাতে-কলমে প্রচার করা হইয়াছিল।

হিন্দু মেলাতেই সর্বপ্রথম 'জাতীয় সংগীত' রচিত ও গীত হইয়াছিল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান', দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না', কবি মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন' প্রভৃতি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত এই হিন্দু মেলাতেই গীত হইয়াছিল। কবি মনোমোহনের গানে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারের বার্তা ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছিল—

দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অনশনে তনু ক্ষীণ।

* * *

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনে কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোকে তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল টেনা ডোর্ কপিন্

ছুঁইস্‌সূতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দীয়াশলাই কাটি তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথের রচিত 'জাতীয় সংগীত' জাতীয় জীবনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। বস্তুত বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' ব্যতীত এমন উদ্দীপক জাতীয় সংগীত বাঙলা ভাষায় আর রচিত হয় নাই ঃ—

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃপ্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান,
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

*　　*　　*

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এই মহান জাতীয় সংগীতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক! হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!" (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯)।

হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। রাজনারায়ণ বসুর কল্পনা এবং নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ ও

কার্যকরী শক্তিই এই হিন্দু মেলার সাফল্যের প্রধান কারণস্বরূপ হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের তুলনা মিলে না। হিন্দু মেলায় জাতীয় ভাব সঞ্চারের মূলে ছিলেন তিনি। তাঁহার 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'সেকাল আর একাল' প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা তিনি "জাতীয় সভা"তেই দিয়াছিলেন।

নবগোপাল মিত্র ছিলেন আগাগোড়া জাতীয়ভাবে ভরপূর, লোকে তাঁহার নামই দিয়াছেন 'ন্যাশনাল নবগোপাল'। জাতীয়ভাব প্রচারের জন্য 'ন্যাশনাল পেপার' নামে তিনি একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দু মেলার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। তিনি তখনকার দিনে একজন ধনীলোক ছিলেন, কিন্তু এই হিন্দু মেলা ও 'ন্যাশনাল পেপার' প্রভৃতির জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছিলেন,—"নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্যে ও উৎসাহে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা হইলেন মেলার পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষ ও মনোমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী হইলেন। এই হিন্দু মেলাতেই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে নাও হয়, সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পত্তন হইল। ঐ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য স্ত্রীলোকদের

সূচী ও কারুকার্য, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক, ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলা উপলক্ষে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত।”

নবগোপাল মিত্রের কথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তিনি দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে অনুরোধ পালনও করিয়াছিলেন। হিন্দু মেলা বন্ধ হইবার পর বৃদ্ধকালে নবগোপালবাবু “কতকগুলি মড়াখেগো” ঘোড়া লইয়া একটি দেশী সার্কাসের দলও গঠন করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙালীর প্রথম সার্কাস। মোট কথা, সর্ববিধ জাতীয় অনুষ্ঠানে নবগোপালবাবুর মহা উৎসাহ ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জাতীয়ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে বাঙালী জাতি স্মরণ করিয়া রাখে নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন,—“তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এদেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও এই হিন্দু মেলার একজন প্রধান উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার প্রাণে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। দেশবাসীর মধ্যে নানা-ভাবে জাতীয়ভাব প্রচারের তিনি চেষ্টা করিতেন এবং সেজন্য লোকলজ্জা, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি উপেক্ষা করিতেও তিনি দ্বিধা

করিতেন না। সমগ্র ভারতের জন্য একটা "সার্বজনীন জাতীয় পরিচ্ছদ"-এর পরিকল্পনা তিনিই প্রথম করেন এবং সেই অদ্ভুত পোষাক পরিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে রাস্তায় বাহির হইতেও তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই। (রবীন্দ্রনাথ—'জীবন-স্মৃতি')। স্ত্রী-স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য সেই সনাতনী রক্ষণশীল যুগে লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সস্ত্রীক ঘোড়ায় চড়িয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত বেড়াইতে যাইতেন। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—'জীবন্-স্মৃতি')। স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বাঙলা ভাষায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক 'পুরু-বিক্রম' ও 'সরোজিনী' তিনিই প্রথম রচনা করেন। এই দুই নাটক তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা'—এই বিখ্যাত গানটি 'সরোজিনী' নাটকে তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—'জীবন-স্মৃতি')। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান' বাঙলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগমনের পূর্বে নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সংগীতকলাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহা সুবিদিত। কবিতা ও সংগীত রচনায় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকটেই রবীন্দ্রনাথের

হাতেখড়ি হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে ও দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথের মনে জাতীয়ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত বাঙলা সাহিত্যের এমন অক্লান্ত সেবক বিরল। শেষ বয়স পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি বাঙলার জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ অগ্রজদের সঙ্গে হিন্দু মেলায় যান। ১৮৭৫ সালে (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৪ বৎসর), হিন্দু মেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ("হিন্দুমেলার উপহার") পঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে হিন্দু মেলায় তিনি আর একটী জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লী দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গভর্মেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ পনের বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। ......সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দু মেলায়

গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।”

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘স্বপ্নময়ী নাটকে’ “দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর” শীর্ষক কবিতা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে একটি ‘স্বাদেশিক সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ইহার একজন সভ্য ছিলেন। হিন্দু মেলার ন্যায় এই ‘স্বাদেশিক সভা’ও রবীন্দ্রনাথের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘জীবন-স্মৃতি’তে লিখিয়াছেন,—

“কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছু ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কি করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশী কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি ক্ষ্যাপামির তপ্ত

হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা অসুবিধাকর হইতে পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্ না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি।"

এই সভার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী ছিল না। দল বাঁধিয়া শিকারে যাওয়া, বাগান-বাড়িতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে চড়ুইভাতি করা, ঝড়ের মধ্যে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া জাতীয় সংগীত গান করা প্রভৃতি যখন যাহা খেয়াল হইত, তাহাই সদস্যেরা করিতেন। স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা, কাপড়ের কল তৈয়ারি প্রভৃতিও তাঁহাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সভার সভাপতি রাজনারায়ণবাবু সদস্যদের পিতামহের বয়সী হইলেও, তাঁহার মনটা শিশুর মতই সরল ছিল, আনন্দে ও উৎসাহে তিনি কিশোর সদস্যদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে অমর তুলিকায় রাজনারায়ণ বসুর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন উজ্জ্বল

হইয়া থাকিবে। তখনকার দিনে বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতার স্বপ্ন রাজনারায়ণ বসুর লেখনীমুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল,—"আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ * * * করিতেছি।"

এইরূপে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবন আরম্ভ হইল। ঘরে-বাহিরে সর্বত্র জাতীয় ভাবের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ তিনি লাভ করিলেন। বাঙলার আকাশে-বাতাসে তখন যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছিল, কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহারই মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা মুকুলিত হইয়া উঠিল।

২

যৌবনের সাধনা

রবীন্দ্রনাথ যখন নবীন যুবক তখন বাঙলা দেশে 'বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ'। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না, তৎকালীন বাঙলার চিন্তা ও ভাব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনিই। যাঁহারা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাঙলা সাহিত্যকে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিয়া, সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর চিত্তে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি অতীব সংকীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একটা নবযুগের স্রষ্টা—নবীন বাঙালী জাতির পথপ্রদর্শক। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি যে প্রবল ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার তরঙ্গ রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে সর্বত্র আঘাত করিয়া জাতির সম্মুখে নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে তিনিই ছিলেন যুগনায়ক। কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" বাঙলার নবযুগের আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধেও এই বর্ণনাই করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার

সংঘর্ষে আমাদের সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের বিদ্যুৎ-ঝলকে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই,—

যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
—'মেঘনাদবধ কাব্য', তৃতীয় সর্গ

তাই তাঁহারা তাল সামলাইতে পারেন নাই; পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় তাঁহারা নিজেদের সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সর্ববিষয়ে পশ্চিমেরই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্য দিয়া এই বিজাতীয় ভাবটা খুব বেশী পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। বাঙলার নবীন যুগের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন এই বিপর্যয়ের ট্রাজেডির একটা বড় দৃষ্টান্ত। এই সর্বনাশা স্রোতের বিপরীত গতি হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করেন পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুও ওই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই জাতির পূর্ব গৌরবের স্মৃতি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বাঙালী জাতিকে নূতন ভিত্তির উপরে গঠন করিবার কার্যে বঙ্কিমচন্দ্রের

কৃতিত্ব অসামান্য। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা, তাহার প্রত্যক্ষবাদ ও কার্যকরী শক্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, বরং উহার মধ্যে যে নবশক্তির রসায়ন আছে, তাহা স্বজাতির চিত্তে সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্য দিকে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরব ও মহত্বও তিনি জাতির সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম ও সমাজকে প্রাচীন জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া একটা নব রূপান্তরের প্রেরণা দিয়াছিলেন। যাহাকে ইংরেজী ভাষায় বলে জাতি ও সমাজের Re-construction বা পুনর্সংগঠন—তাহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মহাব্রত এবং সমস্ত জীবন সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া তিনি এই মহাব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার যুগকে বুঝিতে হইলে এই মূল সূত্রটি ধরিতে ও বুঝিতে হইবে।

বাঙলার জাতীয় আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার উপর এই বঙ্কিম-প্রতিভার প্রভাব অপরিসীম। তাঁহার জাতীয় আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল আত্মশক্তির সাধনা ও ভিক্ষা-নীতি বর্জন। প্রভুজাতির নিকট আবেদন-নিবেদন করিয়া যে কোন জাতি স্বাধীন হইতে পারে না, রাজনীতিতে ভিক্ষুকের যে কোন স্থান নাই, নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কঠোর সাধনার পথেই যে জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে নানাদিক দিয়া এই নিষ্ঠুর সত্যই দেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। একদিকে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা

উদঘাটন করিয়া তিনি জাতির ত্রুটি ও দৌর্বল্য প্রদর্শন করিতে যেমন দ্বিধা করেন নাই, অন্যদিকে স্বজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আশার বাণীও শুনাইয়াছিলেন। জননী জন্মভূমি তাঁহার নিকট কেবল আকাশ, জল, মাটি ও লোকসমষ্টিমাত্র ছিল না,—তিনি ইহার মধ্যে চিন্ময়ী দেবী রূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" সংগীতে মায়ের এই চিন্ময়ী রূপই ধ্যান করা হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ছিল ভক্তিরই নামান্তর। সর্বস্ব ত্যাগ—এই প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি লাভের উপায়। স্বদেশপ্রেমের 'গীতা'স্বরূপ 'আনন্দমঠে' এই সর্বস্ব ত্যাগের সাধনারই পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সন্তানেরা' বলিতেছেন,—জননী জন্মভূমিই আমাদের মা, আমাদের অন্য মা নাই ;—আমাদের গৃহ নাই, পত্নী নাই, পুত্র পরিজন নাই,—আছেন কেবল জননী জন্মভূমি, তাঁহার সেবাতেই আমরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

'বঙ্গদর্শন'-এর মধ্য দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে স্বদেশ-যজ্ঞের হোমানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য যাঁহারা সহকর্মীরূপে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন এক একজন দিকপাল, শক্তিমান পুরুষ। স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ অগ্নি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং সেই অগ্নি চারিদিকে তাঁহারা ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র, কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর

মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি স্বনামধন্য কবি, মনীষী ও সাহিত্যিকেরা বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এই সৌরমণ্ডলের বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সূর্য, আর অন্য সকলে জ্যোতিষ্মান গ্রহ। বাঙলার স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার উদ্বোধনে ইঁহাদের দানের তুলনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ইঁহারা সকলেই ছিলেন আত্মশক্তির সাধক—ভিক্ষা-নীতির ঘোর বিরোধী। ইঁহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির উদ্বোধনই ছিল তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, স্বাধীনতাকামী রাজপুত বীরদের জীবন-কাহিনী, এবং বহু স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিয়া তিনি স্বজাতির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্র সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই বোধ হয় প্রথম প্রয়োগ করেন। ১৮৯০ খৃঃ তিনি গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের "উদ্বোধনী"র শেষে তিনি লিখিয়াছিলেন—"এস আর দেরী করিও না। সময় আসিয়াছে!! গগন বিদারিয়া গাও "বন্দে মাতরম্"—স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক !!!"

স্বদেশপ্রেমিক প্রত্যেক বাঙালী যুবকের যোগেন্দ্রনাথ

বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী পুনঃ পুনঃ পাঠ করা উচিত। উহা স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের মহান্ উৎসস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেনের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হইবে। কেশবচন্দ্র কেবল ধর্ম-প্রবর্তক ও সমাজসংস্কারক ছিলেন না। জাতীয় আন্দোলনের মূলেও তাঁহার দান প্রচুর। সংবাদপত্র প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতিও তিনি দেশবাসীর মনে জাগ্রত করিয়াছিলেন। তখনকার দিনের বহু ইংরেজী-শিক্ষিত নব্যযুবক তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং উত্তরকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলায় একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। বৃটিশ-প্রভুদের নিকট আবেদন-নিবেদন, তাঁহাদের প্রসাদ ভিক্ষাই ছিল এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র। রাজা রামমোহনের পরে তাঁহার রাজনৈতিক শিষ্যেরা এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এই উদ্দেশ্য লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগে রামগোপাল ঘোষ, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র,

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক) প্রভৃতি ছিলেন ঐ আন্দোলনের মুখপাত্র। তারপর আসিল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ইণ্ডিয়ান লীগ'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন ইহার নেতা। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেস ঐ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেরই উত্তরাধিকারীরূপে দেখা দেয় এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পন্থা বা ভিক্ষা-নীতিই ছিল তাহার প্রধান পন্থা। এই কারণেই আত্মশক্তির সাধক ও স্বাধীনতার আদর্শবাদী বাঙলার কবি ও সাহিত্যিকেরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, কংগ্রেস প্রভৃতির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহারা ঐ ভিক্ষা-নীতিকে বরং নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপই করিতেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যের সূতিকাগারেই স্বাধীনতা আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম এবং বাঙলার কবি ও সাহিত্যিকেরাই ধাত্রীর ন্যায় ইহাকে পালন করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য কেবল বাঙলা দেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই ইহাদের নিকট ঋণী। পূর্বোল্লিখিত বিখ্যাত হিন্দু মেলায় বাঙলার কবি ও সাহিত্যিকেরাই ছিলেন কর্ণধার। তাই ইহার মধ্য দিয়া আত্মশক্তি সাধনার সুরই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামী বাঙলা সাহিত্যিকদের নিকট হইতেই আত্মশক্তির সাধনার এই ধারা লাভ করিয়াছিলেন,—এ

বিষয়ে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই যোগ্য শিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-শিষ্য হিসাবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় নিজের মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথকে আত্মশক্তির সাধনাতেও তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়-ভাবের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৮৯২ সালে 'সাধনা' পত্র প্রকাশিত হয় এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে সম্পাদক থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। এই 'সাধনা' পত্রে রবীন্দ্রনাথের বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ, জাতীয়ভাবপূর্ণ কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' এই 'সাধনা'তেই প্রকাশিত হয়।

"কী গাহিবে কী শুনাবে। বল মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ,
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা;

মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

* * *

শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।

* * *

এই সমস্ত লেখারই মূল নীতি ছিল,—আত্মশক্তির দ্বারাই জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। বস্তুত 'সাধনা'কে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সাধনার যুগও বলা যাইতে পারে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জনসভায় যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহারও মূল সুর ছিল ঐরূপ। ১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতার এক জনসভায় (চৈতন্য লাইব্রেরীতে) তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "ইংরেজ ও ভারতবাসী" পাঠ করেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই সভার সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন,—"সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব।

সেদিন যখন আসিবে, তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্ম বেশ, ছদ্ম নাম, ছদ্ম ব্যবহার এবং যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

"সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজা-প্রজার বিদ্বেষ ভাব শাসিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে—ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্যসকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়াই কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি, ইংরেজের নিকট কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষা স্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব, তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল, সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না।··· ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণে নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বত্রই তিনি 'আবেদন-নিবেদনের নীতি'র প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং আত্মশক্তির সাধনার উপরেই জোর দিতেন। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে

রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন এবং নিজের রচিত "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" এই গানটি করেন। তারপর ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি যোগ দেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত জাতীয় সংগীত "বন্দে মাতরম্" নিজে সুরসংযোগ করিয়া গান করেন। সেই হইতে "বন্দে মাতরম্" গান রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরেই প্রতি বৎসর কংগ্রেসে গীত হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণের মধ্যেও এই সুর প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় আন্দোলনে ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান বলা যাইতে পারে। ১৮৯৭ সালে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স বা রাষ্ট্রসম্মিলনীর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ অধিবেশনের সভাপতি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ 'তরুণের দল' ছিলেন। ঐ সময়ে এই সব রাজনৈতিক সম্মিলনীতে বক্তৃতা, প্রস্তাব প্রভৃতি ইংরেজী ভাষাতেই হইত। নাটোরের সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'তরুণের দল' দাবী করিলেন যে, বাঙলা ভাষাতেই সমস্ত কার্য পরিচালিত হইবে। ইংরেজীনবিস প্রবীণেরা প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলে ভারী তরুণদের দাবীই তাঁহাদের মানিয়া লইতে হইল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যে সরস বর্ণনা করিয়াছেন,

তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

"আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করেন, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স বাঙলা ভাষায় হবে। আমরা ছোক্‌রারা সবাই রবিকাকার দলে। আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সে বাঙলা ভাষার স্থান হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্যে। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না। ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয়, তেমনি এখানেও হবে—সব কিছু ইংরেজিতে। অনেক তর্কাতর্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাঙলাতে আর একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে। বসেছি সব, কনফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজীতে হতে পারে না, বাঙলা গানই হলো। 'সোনার বাঙলা' গানটা বোধ হয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল।

"এখন প্রেসিডেণ্ট উঠেছেন স্পীচ দিতে,—ইংরেজীতে যেই না মুখ খোলা, আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম, বাঙলা ভাষার দলে, সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—বাঙলা, বাঙলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজীতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি, বাঙলা, বাঙলা। মহা মুশকিল,

কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ঐ চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু'একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ইংরেজিতুরস্ত, তাঁর মত ইংরেজীতে কেউ বলতে পারত না, তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টারী বক্তা,—তিনি শেষটায় উঠে বাঙলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন,—যেমন পারতেন তিনি ইংরেজীতে বলতে, তেমনি চমৎকার তিনি বাঙলাতেও বক্তৃতা করলেন! আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কনফারেন্সে বাঙলা ভাষা চলিত হোলো। সেই প্রথম আমরা পাবলিক্‌লি বাঙলা ভাষার জন্য লড়লুম।" ('ঘরোয়া'—৭৫-৭৬ পৃঃ)।

১৮৯৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনেও রবীন্দ্রনাথ যোগ দেন। সম্মিলনে দেশীয় ভাষা, দেশীয় ভাব, জাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদের সমর্থন করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন। এই সময়েই বিজাতীয় অনুকরণ ও সাহেবীয়ানার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়া তিনি বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ব্যঙ্গ নাট্য প্রভৃতি রচনা করেন।

১৮৯৮ সালেই রাজদ্রোহের অভিযোগে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার হন। রবীন্দ্রনাথ গভর্মেণ্টের এই কার্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন এবং তিলকের মকদ্দমার ব্যয় চালাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহেরও সহায়তা করেন। রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য

কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় "কণ্ঠরোধ" নামক তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার এক স্থানে তিনি বলেন,—

"একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ী-ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে! একটা ভয়ানক ধূম পড়িয়া গিয়াছে! আমরা এতই ভয়ঙ্কর!

"মূল কথাটা এই, তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী, আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া উঠে, তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করত্বের আর কোন লক্ষণ নাই, কেবল একটি আছে—আমরা অজ্ঞাত।

"সত্যই যদি তাহাই হইবে, তবে হে রাজন্‌, আমাদিগকে আর কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে, তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি, তাহা রোধ করিয়া ফল কি?

"......সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে

পারিবে না। রুদ্ধবাক, সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা।”

৪৪ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে “ভয়ঙ্কর অবস্থা”র কথা লিখিয়াছিলেন, এখনও তাহার পরিবর্তন হয় নাই, বরং নানাদিক দিয়া পূর্বাপেক্ষা উহা আরও বাড়িয়াছে।

এক সময়ে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, কল্পনা-বিলাসী কবি, বাস্তব জগতের সঙ্গে, সাধারণ লোকের সুখতুঃখের সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয় নাই, দেশের জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ নাই। এই ধারণা যে কিরূপ ভ্রান্ত, উত্তরকালে নিজের কার্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের যে সময়ের কথা আমরা এখন বলিতেছি, সেই সময়ে তিনি দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য কঠোর সাধনা করিতেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কেবল বুদ্ধির যোগ নয়, হৃদয়ের যোগও স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিভিন্ন, আবেদন-নিবেদনের পথ তিনি ঘৃণা করিতেন, বঙ্কিমের যোগ্য শিষ্যরূপে আত্মশক্তির সাধনাতেই তিনি দেশের মুক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছিলেন,—

“রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবল মাত্র কাঁতুনীর সুরে ‘কিছু দাও কিছু দাও’ করিয়া

প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।”

উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলন তথা নবজাতীয়তা-আন্দোলনের উপর রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পরে তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

৩

স্বদেশী যুগের উষা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আদেশের পর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আন্দোলন সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল কোন ঐতিহাসিক এমন কথা বলিবেন না। কোন জাতির জীবনেই কোন বৃহৎ ঘটনা, কোন প্রচণ্ড যুগান্তকারী আন্দোলন অকস্মাৎ হয় না, তাহার পশ্চাতে দীর্ঘকালব্যাপী একটা সাধনার ইতিহাস নিশ্চয়ই থাকে। বাঙলার যুগান্তকারী স্বদেশী আন্দোলনের পশ্চাতেও যে এমনই একটা ইতিহাস আছে, তাহার পরিচয় ইতিপূর্বেই আমরা কিছু দিয়াছি। এইবার স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বের কথা—বিশেষভাবে ১৯০০—১৯০৫ এই কয়েক বৎসরের কথা বলিব। এই যুগের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'স্বদেশী যুগের উষা'। সূর্যোদয়ের পূর্বে উষার আগমন, তখনও রাত্রির অন্ধকার ভাল করিয়া কাটে নাই, লোক-কোলাহল ভাল করিয়া জাগে নাই। তবে উদ্যোগপর্বের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, পাখীর কাকলী শোনা যাইতেছে, পূর্বাকাশে অরুণের রেখা কেবল দেখা দিতেছে। বাঙলা দেশেও ১৯০০—১৯০৫ সাল এমনই একটা উদ্যোগ-পর্বের যুগ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন আরও কয়েকজন শক্তিমান পুরুষ।

কিন্তু ইঁহাদের কথা বলিবার পূর্বে আর একজন লোকোত্তর মহাপুরুষ—যুগনায়কের কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-মাতৃকার আদর্শ, আত্মত্যাগ ও কর্মযোগের সাধনা—যাঁহাদের মনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজয়ী ধর্ম-প্রচারক, হিন্দু-সভ্যতার বার্তা তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে শুনাইয়াছিলেন, বেদান্তের ভেরী-নির্ঘোষে ভারতবাসীর বহির্মুখী মন তিনি অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন, কর্মযোগ ও সেবাধর্মের মহিমা জাতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, এসব কথা সুবিদিত। কিন্তু স্বামীজীর জীবনের আর একটা দিক তাঁহার স্বদেশবাসীরা এখনও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার উপাসক—বীর্যবান স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহার ভিতরে যে তীব্র স্বদেশপ্রেম ছিল তাহার তুলনা নাই—যেন অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি। বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়া সেই আগুন তিনি সংযত করিয়া রাখিতেন, কিন্তু তবুও নানাভাবে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীতে—বিশেষত 'পত্রাবলী'তে ইহার নিদর্শন ভূরি ভূরি রহিয়াছে। নবীন ভারতকে প্রধানত তিন দিক

দিয়া তিনি স্বদেশসেবার দীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথমত কর্মযোগ ; তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, রজোগুণ ও কর্মযোগ না হইলে এই জীবন্মৃত জাতি বাঁচিবে না। দ্বিতীয়ত, ত্যাগ ও সেবার সাধনা। তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন নারায়ণজ্ঞানে দেশের জনসাধারণকে—দীন, দরিদ্র, মূর্খকে সেবা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, "ছুঁৎমার্গে"র পরিহার। যাহাদিগকে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয়—অনুন্নত ও অবনত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিতে হইবে, নহিলে জাতির মুক্তি নাই। স্বামীজীর এই বিরাট আহ্বানে ঘুমন্ত জাতি সাড়া দিয়াছিল, কঙ্কালে প্রাণের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা আজ জোর করিয়াই বলিব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে স্বামীজীই জাতিকে নবজীবনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আনন্দ-মঠের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে সর্বক্ষেত্রে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই, যে হোমানল তিনি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহারই সঞ্জীবনী-শক্তি উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলনে অশেষ প্রেরণা দিয়াছিল। এক কথায় স্বামী বিবেকানন্দও স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অগ্রদূত। স্বদেশী যুগের ঊষার আবাহন যাঁহারা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার নাম সর্বাগ্রগণ্য।

১৯০১ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকত্বে একদিন 'বঙ্গদর্শন' যেমন নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'ও তেমনি স্বদেশী যুগের আবাহনে অশেষ কার্য করিয়াছিল। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণোদ্যমে তাঁহার 'আত্মশক্তি'র মূলমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি যে পল্লী হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাও তিনি পাশ্চাত্য রাজনীতির মোহগ্রস্ত শিক্ষিত দেশবাসীকে শুনাইতে লাগিলেন। ভারতের অতীত গৌরব, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এই 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়াই প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তিনি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে যুবক ছাত্র সম্প্রদায়ের রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাহারা সর্বপ্রকারে তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহার কথায় উঠিত বসিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সেই সময়ে বাঙলার ভাব-ও-চিন্তা-জগতের নেতৃত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই সভায় প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিতেন। সেই সমস্ত সভায় এত ভীড় হইত যে, বহু লোককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে এক একটি প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা ২।৩ বার সভা করিয়া করিতে হইত। তখন বঙ্গভঙ্গ হয় নাই, স্বদেশী আন্দোলনও আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা

ও প্রবন্ধের দ্বারা সেই সব ভাববিপ্লবের বীজ পূর্ব হইতেই যুবকগণের চিত্তে বপন করিতেছিলেন।

এই সময়ে আর যে কয়জন শক্তিমান পুরুষ রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে যুবকগণের চিত্তে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হইবে। ইঁহারা দুইজনেই নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক ছিলেন। গৈরিকধারী তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবকে প্রথম যখন অ্যালবার্ট হলের একটি সভায় দেখি* তখন মনে হইয়াছিল—এ যেন মূর্তিমান অগ্নিশিখা। স্বামী বিবেকানন্দের মত তাঁহারও দেহমনপ্রাণ স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল, —দেশের জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখিতেন ও বক্তৃতা করিতেন, তাহার এক একটি ছিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; দেশের চারিদিকে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা হইয়াছিল এবং উভয়ে উভয়ের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে আত্মশক্তির সাধনা রবীন্দ্রনাথের মূল মন্ত্র

---

* সে সময়ে ফারকোহার নামক ওয়াই. এম. সি-এর একজন পাদরী সাহেব হিন্দুধর্ম ও গীতার নিন্দা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অ্যালবার্ট হলের সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি ছিলেন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম বক্তা ছিলেন। প্রধান বক্তারূপে ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুধর্ম ও গীতার গৌরব কীর্তন করিয়া যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই।

ছিল—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও ছিলেন তাহারই সাধক। তিনিও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা ভিক্ষার রাজনীতিকে ঘৃণা করিতেন। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায় ব্রহ্মবান্ধবের দান অশেষ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের সহায়তা পাইয়াছিলেন, ব্রহ্মবান্ধবের নাম তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। স্বদেশী যুগের উষার আবাহনে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যে কত বড় কাজ করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাপ করা কঠিন।

পরবর্তী কালে স্বদেশী তথা নবজাতীয়তা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পালও বাঙলার চিন্তা-ও-ভাব-জগতে এই সময়েই নেতৃত্ব করিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ-উপাধ্যায়ের মত তিনিও প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া যুবকগণের চিত্তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে-ছিলেন। কি ইংরেজীতে কি বাঙলায় তাঁহার মত বাগ্মী আমি আর দেখি নাই। শ্রোতৃবর্গের মন লইয়া তিনি যেন ইচ্ছামত খেলা করিতেন, ভাষার ঐশ্বর্যে ও ভাবের সম্পদে তাঁহার বক্তৃতার এমন একটা সম্মোহিনী শক্তি থাকিত যে, সকলে তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িত। বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করেন। যুবকদলের মনের উপর এই পত্রিকাখানি যে কি অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ভাষায়

প্রকাশ করা যায় না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র নূতন নূতন চিন্তা ও ভাবের অবতারণা করিয়া যুবক বাঙলাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন।

স্বদেশী যুগের এই উষার আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটি"র নাম বাঙলার জাতীয় জীবনে অমর হইয়া থাকিবে। এই "ডন সোসাইটি" ছিল স্বদেশসেবার পাঠশালা। দেশকে কি করিয়া সেবা করিতে হয়, স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার কোন্ পথে হইতে পারে আচার্য সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে "ডন সোসাইটি"র সদস্যেরা সেই সব কথা লইয়া আলোচনা ও গবেষণা করিতেন এবং হাতে-কলমে কাজ করিতেন। ১৯০২—০৩ সাল, তখনও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু "ডন সোসাইটি"র সদস্যেরা নিজেরা মোটা স্বদেশী কাপড় পরিতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। "ডন সোসাইটি"র গৃহে তাঁত বসাইয়া গামছা চাদর প্রভৃতি বোনা হইত, দেশলাই তৈয়ারী করিবার চেষ্টাও হইত। "ডন সোসাইটি"র 'দি ডন' নামক একখানি মুখপত্র প্রকাশিত হইত এবং সদস্যেরাই উহা পরিচালনা করিতেন। ঐ পত্রে স্বদেশী শিল্প গঠন, পল্লী সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। আজ বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব প্রসিদ্ধ কর্মীকে দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তখনকার দিনে "ডন সোসাইটি"র সদস্য এবং

আচার্য সতীশচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। "ডন সোসাইটি'র সঙ্গে আর্যা নিবেদিতা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যোগ ছিল এবং তাঁহারা সোসাইটির সভায় আসিয়া বক্তৃতা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং "ডন সোসাইটি"র হিতৈষী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। অনেক সময় সোসাইটির গৃহে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের সঙ্গে স্বদেশসেবার নানা পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেন। সোসাইটির তরুণ সদস্যদের রবীন্দ্রনাথ দেশসেবার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, বক্তৃতা করিতেন। আমি সোসাইটির একজন নগণ্য সদস্য ছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার কথা আমার বেশ মনে আছে। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ধরিয়া পড়িলাম যে, তাঁহাকে একটি গান গাহিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুতেই রাজী হন না, পরে যুবকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পকেট হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া নূতন রচিত একটি গান করিলেন। যতদূর মনে পড়ে উহা রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে এক্‌লা চল রে।
এক্‌লা চল এক্‌লা চল
এক্‌লা চল রে।

যদি কেউ কথা না কয়—
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বল রে।

* * *

যদি আলো না ধ'রে—
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে
তুয়ার দেয় ঘরে।
তবে বজ্রানলে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে।

* * *

স্বদেশী আন্দোলনে আচার্য সতীশচন্দ্রের দান অপরিমেয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলিয়াছিলেন, "সতীশবাবু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে সকলের আগে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছেন।" এই নীরব সাধক ও কর্মযোগীর কথা মনে হইলে শ্রদ্ধায় শির নত হইয়া পড়ে। তিনি ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী, দেশ ও সমাজের সেবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ও হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হইয়াও নিজের জন্য কোনদিন অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন

নাই। দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বদেশের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশভূষা, পোষাকপরিচ্ছদ দেখিলে মনে হইত, বাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সর্বদা আত্মসমাহিত, প্রসন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। প্রথম যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠিত হয়, তখন সতীশবাবুই তাঁহার শিষ্যদের লইয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি নিজে কোন পারিশ্রমিক লইতেন না, বরং দুই এক স্থানে গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া যে অর্থ পাইতেন, তাহাও এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে দান করিতেন।

এই সময় আর যে কয়েকজন চিন্তানায়ক বাঙলায় আত্মশক্তির আন্দোলন তথা স্বদেশী ভাবের উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আর্যা নিবেদিতার নাম উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী এবং বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক যে অন্তরালে থাকিয়া স্বদেশীভাবের উদ্বোধনে সহায়তা করিতেন, তাহা হয়তো অনেকে জানেন না। সে সময়ে "সাবিত্রী লাইব্রেরি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহার উদ্যোগে মাঝে মাঝে সভা হইত। রামেন্দ্রসুন্দর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষী ঐ সমস্ত সভায় বক্তৃতা করিতেন। যুবকগণের চিত্তে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করাই ঐ সমস্ত বক্তৃতার

লক্ষ্য ছিল। যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেবল সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইত না—জাতিগঠনের ব্যাপার লইয়াও তাঁহারা আলোচনা করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'রাখীবন্ধন' উৎসবের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' তিনিই রচনা করিয়া-ছিলেন। এই সন্ধিক্ষণে আর্যা নিবেদিতার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীও যুবকগণের চিত্তে জাতীয় আত্মমর্যাদার উদ্বোধন করিয়াছিল। আর্যা নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। "ডন সোসাইটি"র সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিল এবং মাঝে মাঝে সোসাইটির সভায় যে তিনি বক্তৃতা করিতেন একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" নামে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তখনকার শিক্ষিত সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং উহার হাজার হাজার কপি প্রচারিত হইয়াছিল। এই "স্বদেশী সমাজে"ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতিগঠনের নিজস্ব পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। দেশ ও জাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। বাহিরে বিদেশী

গভর্মেণ্ট থাকুক, তাহার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টির প্রয়োজন নাই, দেশবাসীর নিজের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রয়োজন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেরাই মিটাইবার চেষ্টা করিবে। নিজেদের শিল্পবাণিজ্য নিজেরাই গড়িয়া তুলিবে। সালিশী প্রথার দ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শান্তি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের ব্যবস্থাও ইহার মধ্যে ছিল, স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। অর্থাৎ বৃহত্তর বিদেশী গভর্মেণ্টের অভ্যন্তরে আর একটি স্বতন্ত্র স্বসম্পূর্ণ "স্বদেশী সমাজ" গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল মূল কল্পনা। আয়র্লাণ্ডের জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজ গভর্মেণ্টের পাশাপাশি যেমন একটি স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাও অনেকটা সেইরূপই ছিল।

এই "স্বদেশী সমাজ" স্থায়ীভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার সদস্যদের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের খসড়া পর্যন্ত তিনি রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রের ভূমিকা ছিল এইরূপ :—

"আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কয়েকজন মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব। আমাদের নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্তব্য সাধন আমরা নিজেরা করিব। আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়দের সাধ্য, তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি

আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব। সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজনির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব। বাঙালী মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।"

এই "স্বদেশী সমাজে"র পরিকল্পনা পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। অসহযোগ আন্দোলনের উপরও ইহার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

১৯০৪ সালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা কলিকাতায় 'শিবাজী উৎসব'। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নব জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে এই শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র-নেতা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য পুনা হইতে কলিকাতায় আসেন। এই শিবাজী উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। ছত্রপতি শিবাজী মোগলের দাসত্বমুক্ত যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিবার জন্য এই শিবাজী উৎসবের পরিকল্পনা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, জাতীয় জীবনে যে নূতন শক্তি সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা জাতির চিত্তে প্রেরণা যোগাইতেছিল, 'শিবাজী উৎসব' তাহারই বহিঃপ্রকাশ।

পরবর্তী কালে যিনি ভারতে নব জাতীয়তা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই উৎসবের পৌরোহিত্য করিয়া জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায়ের স্মচনা করিয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "শিবাজী উৎসব" পাঠ করেন। শিবাজীর আদর্শই যে স্বাধীনতাকামী ভারতকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই কবিতায় স্পষ্টভাবেই কবি তাহা বলেন :—

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্-এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি।
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি,—
"এক-ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"
হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?

তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজা ঘরে
সে সত্য সাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চিরযুগান্তর তরে
ভারতের ধন।

* *

মরে না, মরে না, কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারা ভেবেছিল মনে কোন কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।
আজো তার সেই মন্ত্র,—সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ,—
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ।

* *

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন,—
দরিদ্রের বল.
"এক-ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।

এই স্বদেশী যুগের ঊষাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা ও কাহিনী'র প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রাচীন ভারত এবং আধুনিক কালের মারাঠী, রাজপুত ও শিখ ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতি মন্থন করিয়া এইসব কবিতা রচিত হইয়াছিল। বাঙলার তরুণগণের চিত্তে স্বদেশের বীর্য ও গৌরব-কাহিনী জাগ্রত করাই ছিল ঐ সব কবিতার উদ্দেশ্য। বাঙলার তরুণ ও যুবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে এইসব কবিতা এখনও ধ্বনিত হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত কালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশ। শ্রীযুত কেদারনাথ দাশগুপ্তের অর্থে ও উদ্যোগে এই 'ভাণ্ডার' পত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 'ভাণ্ডারে' জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা হইত, বিশেষভাবে আলোচনা হইত স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসারের সমস্যা। দেশের নেতারা যে সব চিন্তা করিতেন,

জনসাধারণের মধ্যে সহজ ভাষায় তাহা প্রচার করা 'ভাণ্ডারে'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি 'ভাণ্ডার'-এর আলোচনায় যোগদান করিতেন। কেবল স্বদেশী শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই 'ভাণ্ডারে'র কর্তব্য শেষ হয় নাই। শ্রীযুত কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামক স্বদেশী শিল্পজাতের একটি বিপণীও খোলা হয়। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী উহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী যে 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তন করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব যে তখনকার দিনে যুবকদের চিত্তে জাতীয়ভাবের উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাও জাতীয়ভাব প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একবৎসর 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০০-১৯০৫—এই পাঁচ বৎসর বাঙলার জাতীয় জীবনে মহাসন্ধিক্ষণ। এই পাঁচ বৎসরে বাঙলা দেশ এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, এই 'স্বদেশী যুগের ঊষায়' জাতির ভাব ও চিন্তা পরিচালনার কার্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৪

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলন বাঙলার তথা ভারতের ইতিহাসে অপূর্ব ঘটনা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কলমের খোঁচায় বাঙলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ফলে তাহার বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির মধ্যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষে সে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, নচেৎ হইত না, একথা আমি মনে করি না; ইতিহাসও সেরূপ সাক্ষ্য দেয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী জাতি স্বাধীনতার তপস্যায় হোমাগ্নির যে সমিধ সঞ্চয় করিয়াছিল, এই বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাই আজ পূর্ণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বহুকালের জাতীয় অপমান ও নির্যাতনের ফলে জাতির চিত্তে যে রুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত হইতেছিল, বঙ্গভঙ্গের আঘাতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মত তাহাই আজ প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিল এবং দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিল। নদীর বাঁধ ভাঙিয়া গেলে জোয়ারের জল যেমন প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসে, এ যেন অনেকটা সেইরূপ। আমার বিশ্বাস লর্ড কার্জন যদি বঙ্গভঙ্গ নাও করিতেন, তথাপি অন্য কোন একটা

ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইত। মানুষের জীবনেও দেখা যায়, কোন একটা আকস্মিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই দীর্ঘকালের প্রতীক্ষিত বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাঙালী জাতি যখন দেখিল, তাহাদের জাতীয় সংহতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য সমস্তই বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে, তখন তাহাদের অবরুদ্ধ শক্তি প্রচণ্ড বিক্ষোভে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় সার্ভিয়ার একজন লোক অস্ট্রিয়ার প্রিন্সকে হত্যা করিয়াছিল; এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার প্রিন্সকে হত্যা না করিলে সেই সমরানল প্রজ্বলিত হইত না, এমন কথা কে বলিবে?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে জাতীয় আন্দোলনের দুইটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। একটি ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে কংগ্রেসের জন্ম পর্যন্ত এই ধারা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেস ইহারই উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। বাঙলা দেশের নেতারাই কংগ্রেসের জন্ম হইতে উহাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার,

যাত্রামোহন সেন, আনন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। যখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন বাঙলার এই সব কংগ্রেস-নেতারাই সর্বাগ্রে উহার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাঙলার সর্বত্র সভাসমিতি বক্তৃতা করিয়া জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিবার জন্য তাঁহারা ব্রিটিশ গভর্মেন্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে আর একদল নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা নিয়মতান্ত্রিকতা বা ভিক্ষা-নীতির বিরোধী —আত্মশক্তির সাধক এবং বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রভৃতি বাঙলার সাহিত্যিক ও মনীষীদের ভাবধারার উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ধারার একজন অগ্রগামী পথিক। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিও ছিলেন তাঁহারই সহযাত্রী। যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন এই আত্মশক্তির সাধকেরাও সেই আন্দোলনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই নবীন দল বলিলেন, ও সব আবেদনে কিছু কাজ হইবে না, আমাদের জাতীয় শক্তির সাধনা করিতে হইবে ও তাহার পরিচয় দিতে হইবে, তবেই ইংরেজ কেবল বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য হইবে। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালনাও এই নূতন দলের নেতাদেরই পরিকল্পনা। একদিকে আমাদের স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচার,

অন্যদিকে বিদেশী শিল্প বর্জন বা বয়কট—অর্থ নৈতিক সংগ্রামের এই দুইটি উপায় তাঁহারা নির্দেশ করিলেন। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও এই নূতন রাজনৈতিক সংগ্রামের আর একটি অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইল।

নূতন দলের শক্তিশালী নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই সময়ে 'সন্ধ্যা' নামক বিখ্যাত দৈনিকপত্র প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক শক্তিমান ব্যক্তি আসিয়া যোগ দিলেন, যথা—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র পালও তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে জ্বালাময়ী ভাষায় নূতন দলের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি রাজনৈতিক সংগ্রামের পন্থা হিসাবে বিপিনচন্দ্রই প্রথমে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 'সত্যাগ্রহ' নীতি অবলম্বন করেন। বিপিনচন্দ্রের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' যে মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহে'র উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রবাদীরা ভারতের জন্য তখন 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' বা 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' চাহিতেন। বহু বৎসর পর্যন্ত—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব আরম্ভ হইবার পরেও, কংগ্রেসের এই ঔপনিবেশিক

স্বায়ত্তশাসনের বেশী কিছু দাবী করে নাই। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সেই স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই জাতির পক্ষ হইতে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে জোরের সঙ্গে Full Autonomy বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রচার করিতে লাগিলেন। নূতন দলের মতবাদ এইভাবে দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল, দেশের যুবকেরা তাহাতে সাড়া দিতে লাগিল।

এই সময়ে সর্বপ্রধান স্মরণীয় ঘটনা বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের যোগদান। এই অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ যেন যাদুমন্ত্রবলে বাঙলার রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে যে নূতন শক্তি দেশের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত সহজভাবেই তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নূতন দল প্রতিষ্ঠিত হইল—নব জাতীয়তা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় ইংরেজী দৈনিক পত্র 'বন্দে মাতরম্' নবীন দলের মুখপত্ররূপে এই নব জাতীয়তা আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিল। সে আন্দোলন আর বাঙলা দেশে সীমাবদ্ধ থাকিল না—দেখিতে দেখিতে উহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়, মধ্যপ্রদেশের ডাঃ মুঞ্জে এই নব জাতীয়তা আন্দোলনের পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বিপিনচন্দ্র দাবী করিয়াছিলেন Full Autonomy বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। শ্রীঅরবিন্দ আরও স্পষ্টভাবে জাতির পক্ষ হইতে দাবী

করিলেন—Independence বা স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা যে ভিক্ষার পথে লাভ হইবে না, তাহার জন্য আত্মশক্তির সাধনা করিতে হইবে, ইহাও তিনি নির্ভীকভাবে জাতির নিকট প্রচার করিলেন। এই সম্পর্কে 'বন্দে মাতরম্'-এর 'Crime of Nationalism' প্রবন্ধ বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-ব্রহ্মবান্ধবের প্রচারিত এই নব জাতীয়তাবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও ভাবধারার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রচারিত আদর্শ ও ভাবধারা এই আন্দোলনের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার যে চিন্ময়ী রূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দপ্রমুখ নব জাতীয়তাবাদীরা সেই রূপই যেন প্রত্যক্ষ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপদিষ্ট আত্মোৎসর্গ, কর্মযোগ ও শক্তির সাধনাকেই তাঁহারা স্বাধীনতা-লাভের পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সংগীত জাতীয় সংগীত বলিয়া গৃহীত হইল, "বন্দে মাতরম্" শব্দ দেশসেবক সন্তানদের 'মন্ত্র' বলিয়া গণ্য হইল। শ্রীঅরবিন্দ এই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত; তিনিই প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারত আজ সেইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া থাকে।

নব জাতীয়তাবাদীরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়"। উত্তর কলিকাতার দেশভক্ত শিক্ষিত যুবকেরা এই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় রাজপথে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিয়া জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। তখনকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজপথে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিয়া যাইতে দেখিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের সভাগৃহে জাতীয়ভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি, বক্তৃতা প্রভৃতিও হইত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উহাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন এবং স্বরচিত গান গাহিতেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব। বঙ্কিম-চন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনেই এই উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'বন্দে মাতরম সম্প্রদায়' সদলবলে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং জাতীয় সংগীত গান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে কয়েক সহস্র লোক এই উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছিল। কাঁঠালপাড়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতেও বহু লোক আসিয়াছিল। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল জাতীয় মেলা। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখের বিস্তৃত মাঠে এই মেলা বসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা তাহাদের নানা কৃষিজাত ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য মেলায় বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে,

কবির দল, পাঁচালীর দল, তীর ধনুকের খেলা প্রভৃতি গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। উপাধ্যায় বলিতেন যে, বিলাতী কায়দায় স্মৃতিসভা করা আমাদের জাতির ধাতের সঙ্গে খাপ খায় না, এই গ্রাম্য মেলার দ্বারাই আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও ভাল করিয়া স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি। সে যাহা হউক, অপরাহ্নে আধুনিক রীতিতেও মেলাক্ষেত্রে একটি সভা হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ও সাহিত্য-শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়। তিনি সঙ্গে দুইটি বালক গায়ককে লইয়া আসিয়াছিলেন। সভার প্রথমে তাহারা উঠিয়া জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র' মধুরকণ্ঠে গান করিল। একটি বালিকা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাজিয়ে যাব মল' কবিতাটি চমৎকার আবৃত্তি করিল। তারপর শ্বেতকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে করিয়া তাঁহার এমন ভাবাবেগ হইল যে, তিনি বক্তৃতা করিতে পারিলেন না, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভা শেষ করিলেন। সন্ধ্যার পর বঙ্কিমচন্দ্রের পূজার দালানে রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়া 'আনন্দমঠ' অভিনীত হইল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বয়ং সত্যানন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র প্রভৃতির ভূমিকা কাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে না। এইরূপে রাত্রি প্রায় ৯টার পর বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব শেষ হইল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশব্যাপী যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইল, তাহার সম্মুখে এইরূপে প্রাচীন ও নবীন দুই দলই আসিয়া দাঁড়াইলেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিকতার ধারা এবং নবীন আত্মশক্তির ধারা কর্মক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে মিলিত মিশ্রিত হইয়া গেল। গঙ্গা ও যমুনার দুই ধারা যেমন প্রয়াগ-সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তেমনি করিয়া বাঙলার রাজনীতির এই প্রাচীন ও নবীন ধারা মিলিত হইয়া বিরাট স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হইল। স্বদেশী আন্দোলন যে এমন শক্তিশালী হইয়াছিল, দেশের চিত্তে সমস্ত দিক হইতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মূল কারণ ইহাই। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহাতে প্রাচীন ও নবীন দলের মিলিত শক্তির প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল। বলিতে গেলে কংগ্রেসের আর সে পূর্বের মূর্তি রহিল না, উহা নবরূপান্তরিত হইল। আর বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচারের পর দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশ তাহার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইয়া "settled fact"কে যে "unsettled" করিয়াছিল, ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিয়াছিল, তাহাও এই সম্মিলিত শক্তির জোরেই সম্ভব হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে প্রদীপ্ত ভাস্কর মূর্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ

এই সময়েই হইয়াছিল ; কৈশোর হইতে তিনি যে দেশপ্রেম ও সেবার সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল এই সময়েই জাতিকে তিনি পূর্ণরূপে দান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহা কেবল আমাদেরই অভিমত নহে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এইরূপ মনে করিতেন। শ্রীমতী রাণী চন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তখন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি নিঃশঙ্ক বেপরোয়াভাবে কাজ করেছি! যা মাথায় ঢুকেছে করে গেছি—কোনো ভয়-ডর ছিল না। আশ্চর্য রূপ দিয়েছে, ছবির পর ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ, আর তাদের রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। আজ অবনের গল্পে সে কালটা যেন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। আবার সে যুগে ফিরে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ঐখানেই পরিপূর্ণ আমি। পরিপূর্ণ আমাকে লোকে চেনে না—তারা আমাকে নানাদিক থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখেছে। তখন বেঁচে ছিলুম,—আর এখন আধমরা হয়ে ঘাটে এসে পৌঁচেছি।" *

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই রবীন্দ্রনাথ তাহার তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৯০৫ সালের ২৫শে আগস্ট বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" পাঠ করেন। ভীড় এত বেশী হইয়াছিল

---

* শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'ঘরোয়া' গ্রন্থের ভূমিকা।

যে, বহু লোক টাউন হলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই কারণে এক সপ্তাহ পরে আর এক স্থানে সভা করিয়া পুনরায় ঐ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহার পর প্রায় প্রতিদিনই নানা স্থানে জনসভা হইতে লাগিল এবং রবীন্দ্রনাথ বহু সভাতেই যোগদান করিয়া প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে রচনা করিতে লাগিলেন ও প্রত্যেক সভাতেই ঐ সমস্ত সংগীত গীত হইতে লাগিল। সমগ্র দেশ এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হইবে বলিয়া গভর্মেণ্ট ঘোষণা করেন। ঐ দিনই চিরস্মরণীয় রাখীবন্ধনের উৎসব ধার্য হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহযোগিতায় এই উৎসবের পরিকল্পনা করেন। সমগ্র বাঙালী জাতি অতি সহজেই এই উৎসব গ্রহণ করিয়াছিল এবং বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এবং তাহারও পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) তারিখে এই উৎসব পূর্ণোদ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া এই উৎসবের জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়া গিয়াছেন—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান্।

বাঙলার ঘর বাঙলার হাট
বাঙলার বন বাঙলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান্।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান্।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান্।

এই গান গাহিয়া অখণ্ড বাঙলা ও ভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ লোকে পরস্পরের হাতে রাখী বন্ধন করিত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব অনুভূতি—যাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

১৬ই অক্টোবর সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ নিজে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া রাখীবন্ধন উৎসব করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থ হইতে তাহার অপূর্ব শব্দচিত্র পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"ঠিক হলো সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাবে। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব। রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না! কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী

আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম যে, সব কাপড় জামা নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চল্‌ল স্নানে—মনিব-চাকরে এক সঙ্গে স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে—গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চল্‌ল—

বাঙলার মাটি
বাঙলার জল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান্।

এই গানটি সে সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকারণ্য। রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হলো—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল, তাদেরও হাতে রাখী পরানো হলো। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আস্‌ছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মল্‌ছে। হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান,

মুসলমানকে রাখী পরানো—এইবার একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে। আসছি, হটাৎ রবি-কাকার খেয়াল হল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হোলো চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না।

······আমরা সব বসে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী কী হলো তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে,—বল্‌লে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতর, মৌলবী টৌলবী যাদের পেলুম, হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম—আর মারামারি। সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে, ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্‌ বাঁচা গেল। এখন হেসে—এখন যাও তো দিকিনি, মসজিদের ভিতর গিয়ে রাখী পরাও তো—একটা মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।"

৫

স্বদেশী আন্দোলন (শেষার্ধ)

১৬ অক্টোবর (১৯০৫) রাখীবন্ধন উৎসবের * পর 'ফেডারেশনের হল-গ্রাউণ্ডে' (বর্তমানে আপার সার্কুলার রোডস্থিত ব্রাহ্ম বালিকাশিক্ষালয়ের উত্তরে অবস্থিত) বিরাট জনসভা আহূত হইল। প্রবীণ কংগ্রেসনেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসু ঐ সভার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনবাবু তখন বৃদ্ধ—রোগে শয্যাশায়ী। তৎসত্ত্বেও সেই জাতীয় সঙ্কটের দিনে তিনি দেশমাতৃকার আহ্বানে রোগশয্যা হইতেই উঠিয়া আসিলেন। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তাঁহাকে 'ইনভ্যালিড চেয়ারে' করিয়া সভাস্থলে আনা হইল। আনন্দমোহন বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা বঙ্গ-বিভাগ কখনই মানিয়া লইবেন না এবং যতদিন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের ঐ আদেশ বাতিল না হয়, ততদিন জাতির সমস্ত শক্তি দিয়া আন্দোলন চালাইবেন। ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড বাঙলার প্রতীকস্বরূপ ফেডারেশন হল বা "মিলন

---

* রাখীবন্ধন উৎসবের প্রসঙ্গে মৌলবী লিয়াকত হোসেনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই আত্মত্যাগী দারিদ্র্যব্রতী স্বদেশসেবক প্রতি বৎসর ৩০ শে আশ্বিন ছাত্র ও যুবকদের লইয়া মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসব করিতেন ও "বন্দে মাতরম্" গান গাহিতেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হইবার পরও বহু বৎসর তিনি এই জাতীয় উৎসব রক্ষা করিয়াছিলেন।

মন্দির”-এর ভিত্তিও ঐ দিন আনন্দমোহন স্থাপন করিলেন। আনন্দমোহন নিজে তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতে পারিলেন না, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষ হইতে ঐ বক্তৃতা জলদগম্ভীর স্বরে পাঠ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তিনিই আনন্দমোহনের বক্তৃতা বাঙলায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন। তারপর বাঙলা ও ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য বা প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করা হইল। বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী নিরস্ত হইবে না এবং তাহারা কেবল স্বদেশী দ্রব্যই ব্যবহার করিবে, কোন বিদেশী পণ্য ক্রয় করিবে না, ইহাই ছিল সঙ্কল্পের সার মর্ম। বাঙলার সর্বত্র হাজার হাজার সভায় দিনের পর দিন সেই জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য পঠিত হইয়াছিল। সাধারণত ঐসব সভায় সভাপতি সঙ্কল্পবাক্য বা প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে সমস্বরে উহা আবৃত্তি করিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু সভায় জনসাধারণকে জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য আবৃত্তি করাইয়াছিলেন। ১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণেই বাগবাজারে পশুপতি বসুর বহির্বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে আর একটি বিরাট জনসভা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বক্তৃতা করেন। এই সভায় প্রধানত রবীন্দ্রনাথের আবেগময় আহ্বানে ‘জাতীয় ভাণ্ডার’-এর জন্য ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণপুর (হাওড়া) প্রভৃতি আরও কয়েকটি স্থানে সভা করিয়া জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার

কিছুদিন পরে পশুপতি বসুর বাড়ীর সেই প্রাঙ্গণেই যে 'বিজয়া সম্মেলন' হয়, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নবীন জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে "বন্দে মাতরম্" শব্দটি 'জাতীয় মন্ত্র' হইয়া উঠে।* ঠিক এই কারণেই পুলিস ও সিভিলিয়ান—সংক্ষেপে আমলা-তন্ত্রের পক্ষে "বন্দে মাতরম্" শব্দটি বিষবৎ মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা উহাকে "বিদ্রোহ-ধ্বনি" বলিয়াই গণ্য করিতে লাগিলেন। বাঙলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ এক সার্কুলার জারি করিয়া বসিলেন যে, কোন ছাত্র স্বদেশী সভায় যোগদান করিলে অথবা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করা হইবে। ইহাই কুখ্যাত "কার্লাইল সার্কুলার"। এই সার্কুলারের ফলে বাঙলার ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। উহার প্রতিবাদ করিয়া বাঙলার সর্বত্র জনসভা হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা অঞ্চলে এইরূপ কয়েকটি সভায় সরকারী স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। "কার্লাইল সার্কুলার"-এর ভয়ে যুবক ও ছাত্রেরা ভীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে স্বদেশী সভায় যোগ

* স্বদেশী আন্দোলনে "বন্দে মাতরম্"ধ্বনি কবে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে টাউন হলে যে বিরাট 'বয়কট' সভা হইয়াছিল, তাহাতেই "বন্দে মাতরম্"-ধ্বনি প্রথম উচ্চারিত হয়।

দিতে লাগিল এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে লাগিল। ফলে পুলিসের লাঠি তাহাদের মাথায় পড়িল, বহু ছাত্র বিদ্যালয় হইতেও বিতাড়িত হইল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ করাই রাজদ্রোহের তুল্য একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিল। বাঙলার নানাস্থানে, বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও আসামে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিয়া বহু লোক পুলিসের লাঠি খাইল, অনেকে জেলেও গেল। এই সময়েই বরিশালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স' কি ভাবে ম্যাজিস্ট্রেট ভাঙিয়া দেন এবং নেতারা কেহ কেহ গ্রেপ্তার হন, দেশবাসী নিশ্চয়ই তাহা বিস্মৃত হন নাই। এই কনফারেন্সেই মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন পুলিসের পুনঃপুনঃ লাঠির আঘাত খাইয়াও অজ্ঞান হইয়া না পড়া পর্যন্ত কিছুতেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি ত্যাগ করেন নাই। "বন্দে মাতরম্" সেই দিন হইতে সত্যই "জাতীয় মন্ত্রে" পরিণত হইল। ইহার জন্য কতজন যে দুঃখবরণ করিয়াছে, নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান নানাদিক দিয়া অসামান্য। সভাসমিতিতে বক্তৃতা, সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রভৃতির দ্বারা দেশবাসীর চিত্তে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তিনি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া আরও দুই দিক দিয়া স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার দানের প্রাচুর্য বিশেষভাবে

স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমত, জাতীয় সংগীত রচনা, দ্বিতীয়ত, জাতীয় শিক্ষা প্রচার। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে 'গানের রাজা' আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিক সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙলা দেশে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত অধিকসংখ্যক এবং এত বিচিত্র ভাবপূর্ণ গান পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন কবি রচনা করেন নাই! রবীন্দ্রনাথের এই সংগীতাবলীর মধ্যে আবার জাতীয় সংগীত বা স্বদেশপ্রেমের সংগীতের সংখ্যা প্রচুর। স্বদেশী যুগে কয়েক সহস্র জাতীয় ভাবপূর্ণ সংগীত বাঙলা দেশের কবিগণ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথের দানই সর্বাধিক। দেশমাতৃকাকে তিনি যে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, জাতীয় আন্দোলনে যেভাবে নিজের মনপ্রাণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই প্রেম, সেই আত্মোৎসর্গ ই সহস্র ধারায় তাঁহার গানের মুখে উৎসারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গান একদিকে যেমন গভীর দেশপ্রেম, অন্যদিকে তেমনি অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলার সর্বত্র সহস্র সহস্র জনসভায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত গান গীত হইত। দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশী ভাবের সঞ্চারে উহা যে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার সমগ্র স্বদেশী সংগীতের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সামান্য কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

দেশমাতৃকা যে গাছপালা, মাটি, জল, আকাশ, গ্রাম-নগর লোকসংখ্যার সমষ্টিমাত্র নহেন, ইহার অন্তরালে তাঁহার যে চিন্ময়ী রূপ আছে, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, হাজার হাজার বৎসরের সুখদুঃখ বেদনা, ইতিহাসের ভাঙাগড়া উত্থানপতন—সমস্ত মিলিয়া সহস্রদল পদ্মে সেই চিন্ময়ী জননীর পাদপীঠ রচনা করিয়াছে, এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" সংগীত সেই চিন্ময়ী দেশ-জননীর ধ্যান। বঙ্কিম-শিষ্য রবীন্দ্রনাথও মাতৃভূমির এই চিন্ময়ী রূপকেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।—

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী ॥
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥

* * * *

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

বঙ্গজননীর এই ভুবনমোহিনী রূপ কবি যেন আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি যেন ধ্যাননেত্রে এই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অথবা—

ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি
মর্মে গাঁথা॥ ইত্যাদি।

এখানে দেশজননীর মূর্তিকে কবি বিশ্বজননীর মূর্তির মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছেন। আবার—

আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী ?
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাটে-নেত্র আগুন-বরণ।

ওগো মা—
তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে,
রৌদ্র-বসনী !···

স্বদেশী আন্দোলনে জাতির চিত্তে যে প্রলয়ের ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে এই ভীষণ-মধুর-রূপে বঙ্গমাতার আবির্ভাব। কবি সেই জ্যোতির্ময়ী কল্যাণময়ী মাকেই এই গানে ধ্যান করিয়াছেন।

দেশের প্রতি অণু-পরমাণু, তাহার আকাশ জল বাতাস, শ্যামল বনানী, আম্রবনঘেরা নদীকূল, নিভৃত পল্লী—সকলের সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যে নিগূঢ় যোগ, যে সমতার বন্ধন—কবি তাহার অমর সংগীত 'সোনার বাংলা'য় সেই ভাব অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

*　　*　　*　　*

ও মা,　ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা,　অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা কী ছায়া গো,
কী স্নেহ কী মায়া গো,
কী　আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা,　তোর মুখের বাণী, আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায়, হায় রে)—
মা,　তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

*　　*　　*　　*

ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায়, হায় রে)—

ও মা, আমার যে ভাই, তা'রা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

* * * *

অথবা—

সার্থক জনম আমার
. জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে। ইত্যাদি

ইহাতেও কবির সেই স্বদেশপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্য এক শ্রেণীব গানে কবি জাতিকে স্বাধীনতার তপস্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, অত্যাচারীর রক্তনেত্র, নির্যাতন, নিপীড়ন উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক উন্নত শিবে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেন ঃ—

(১) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে এক্‌লা চলো রে। ইত্যাদি

(২) তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না।
তোর আশা লতা প'ড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয়তো 'রে ফল ফ'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না।
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
অই ব'লেই কি রইবি থেমে,

ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্ব'লবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না ॥ ইত্যাদি

(৩) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা ব'লে ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক্ দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে' বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥

(৪) আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে ॥

* * * *

বাহির যদি হ'লি পথে
ফিরিস্‌নে তুই কোনো-মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই-যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয়-চরণ শরণ ক'রে
বাহির হ'য়ে যা রে ॥

(৫) আমি ভয় ক'র্‌বো না, ভয় ক'র্‌বো না।

দু-বেলা মরার আগে

ম'র্‌বো না, ভাই, ম'র্‌বো না।

তরীখানা বাইতে গেলে

মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;

তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে

কান্নাকাটি ধ'র্‌বো না॥ ইত্যাদি

(৬) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,

আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা॥

আমি তোমার চরণ ক'র্‌বো শরণ,

আর কারো ধার ধার্‌বো না, মা॥ ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের যে দুইটি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত আজ সর্বত্র গীত হয়—

(১) দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,

আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।

দিন আগত ঐ,

ভারত তবু কই? ইত্যাদি

(২) জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!

এগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের অপূর্ব সৃষ্টি। এই সব সংগীতে ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে বিশ্বমানবের মুক্তি-সাধনার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্‌" ব্যতীত আর কোন জাতীয় সংগীত এই সব

সংগীতের মতো জাতির চিত্তের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় উহারই সঙ্গে সঙ্গে যে 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাতেও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত বিজাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহরূপেই এই 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' দেখা দিয়াছিল। যে শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমির যোগ নাই, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন, সর্বোপরি যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নীতির করায়ত্ত, সে শিক্ষা কখনই জাতির মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন করিতে পারে না। অতএব সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজেদের আয়ত্তাধীনে, আমাদের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষানীতি প্রবর্তিত করিতে হইবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই ছিল সংক্ষেপে 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন'-এর মূল কথা। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং তারকনাথ পালিত এই আন্দোলনের জন্য প্রভূত অর্থ দান করেন এবং তাঁহাদেরই

অর্থসাহায্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথমে যখন অপেক্ষাকৃত সামান্য সম্বল লইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন কয়েকজন ত্যাগী, নিঃস্বার্থব্রতী কর্মীই উহাকে ধাত্রীর ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীযুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে সন্ন্যাসী), ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ৺কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅরবিন্দও কিছুকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। সেই সময় কলিকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে বাঙলার নানাস্থানেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তরকালে যখন এই আন্দোলনেব তীব্রতা হ্রাস হয় এবং পূর্বেকার হিতৈষীদের অনেকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন, তখনও যাঁহারা আহিতাগ্নিকের মত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সর্বাগ্রগণ্য। প্রধানত তাঁহারই নীরব সাধনা ও অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় যাদবপুরের বিরাট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাঙলার, শুধু বাঙলার কেন, ভারতের অন্যতম গৌরবের বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হয়, তখন তিনি বিশেষ উৎসাহসহকারে ইহাতে যোগ দিতেন। এমন কি জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা নির্বাচন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা প্রভৃতি কার্যেও তিনি অংশগ্রহণ করিতেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, কিছুদিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হ্রাস হয়। সম্ভবত জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁহার নিজের আদর্শ ও পরিকল্পনা উহাতে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠে নাই। তিনি ইতিপূর্বেই ব্রহ্মবান্ধব-উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বোলপুর শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাকেই নিজের আদর্শ অনুসারে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন পরে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন আসিয়া তাঁহার কার্যে যোগদান করেন।

স্বদেশী যুগে যে নূতন জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভব হয়, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঙলার কবি ও মনীষীদের প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের ইঁহারাই ছিলেন উত্তরসাধক। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি স্বভাবতই এই নূতন দলের প্রতি ছিল এবং তিনি নিজেও এই দলের অন্যতম নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে এই দলের সঙ্গে যুক্ত হন নাই, দলগত রাজনীতির বাহিরে কতকটা নিরপেক্ষভাবেই থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিক দলের সঙ্গেও তিনি যোগ দিয়া কাজ করিতেন। অনেক

বিষয়ে তিনি উভয় দলের মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রাচীন ও নবীন দল একযোগে কাজ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তাঁহার "দেশনায়ক" প্রবন্ধে এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বাঙলার একমাত্র নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সমমতাবলম্বীদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে ভেদ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত কোন কোন দিক দিয়া উহা মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। "নরমপন্থী" (মডারেট) ও "চরমপন্থী" (একস্‌ট্রিমিস্ট) বলিয়া দুই দলের নামকরণও হইয়া গেল। কংগ্রেস কমিটির সভায়, নানাস্থানে জনসভায়, নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের কলহ ও বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। চরমপন্থীরা দলে ভারী, দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁহাদের সমর্থক, সুতরাং নরমপন্থীরা তাঁহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল বাঙলায় নয়, ভারতের সমস্ত প্রদেশেই—বিশেষত মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে এই দ্বন্দ্ব আত্যন্তিকরূপে দেখা দিল। প্রবীণ নরমপন্থীরা ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু নবীন চরমপন্থী দল তাহা মানিয়া লইলেন না, তাঁহারা তৎস্থলে লোকমান্য

বালগঙ্গাধর তিলকের নাম প্রস্তাব করিলেন। ফলে সুরাট কংগ্রেসে "দক্ষযজ্ঞ" হইল, কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হইয়া গেল। প্রবীণ নরমপন্থীরা এলাহাবাদে ফিরিয়া গিয়া বৈঠক করিলেন এবং নবীন দলকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহার ফল ভাল হইল না, কয়েক বৎসরের মধ্যে নবীন দলই বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসে প্রাধান্য স্থাপন করিলেন এবং প্রবীণ দলই কংগ্রেস হইতে সরিয়া গিয়া "লিবারেল ফেডারেশন" গঠন করিতে বাধ্য হইলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই এইসব দ্বন্দ্ব-কোলাহল হইতে দূরে থাকিতেন। সুরাট কংগ্রেসের পর তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আরও দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু নবীন দলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি হ্রাস হয় নাই। নবীন দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ একাধারে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতায় তাহার অক্ষয় নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯০৭ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয়স্বরূপ এই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না,—

> অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
> হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ আত্মার
> বাণী-মূর্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান,

নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির রাত্রি দিন
তপোমগ্ন ; যার লাগি' কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট-যাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে ;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।·········

* * * *

জয়, তব জয়।

কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল ?
মোছরে, দুর্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল।

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন।.........

* * * *

যিনি নানা কণ্ঠে কন্ নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে একটা মিলন প্রয়াসের নিদর্শনস্বরূপই রবীন্দ্রনাথকে এই অধিবেশনের সভাপতি করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই সভাপতিত্ব

করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই, বলিতে গেলে, তাঁহার প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদানের শেষ দৃষ্টান্ত। ইহার পর তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, নানা কারণেই তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবনে "যুগ পরিবর্তনের" সূচনা করে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া গঠনমূলক স্বদেশসেবাতেই যে তিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহা এই অভিভাষণে সুস্পষ্টরূপেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেকথা বারান্তরে আলোচনা করিব।

৬

গঠনমূলক স্বদেশ সেবা

১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দেন, একাধিক কারণে তাহার বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে যাঁহারা ঐ সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বাঙলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙালীর মাতৃভাষা তখনও 'জাতে উঠে নাই'। ইহা আজিকার দিনে অদ্ভুত শুনাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ঐরূপই ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম রাষ্ট্র সম্মেলনে বাঙলা ভাষায় সভাপতির বক্তৃতা করেন। সেই হইতেই রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙলা ভাষা তাহার নিজস্ব স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয়ত, এই সময় হইতেই জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" নামক যে বক্তৃতা করেন, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বক্তৃতার মধ্যেই তাঁহার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল আলোড়নের সঙ্গে যোগ দিলেও কবি তাঁহার স্বদেশ সেবায় ঐ নিজস্ব ভাব ও আদর্শ

কখনই বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সমুদ্রমন্থনে কেবল অমৃত ও লক্ষ্মীই উঠেন নাই, হলাহলও উত্থিত হইয়াছিল। কাহারা নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সেই হলাহল পান করিয়াছিল, সেকথা এখানে আলোচনা করিব না। ১৯০৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অন্তরালে সরিয়া গেলেন এবং গঠনমূলক কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। তৎপূর্বে ১৯০৭ সালেই "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"দেশের যে সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে,—সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও, মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে—সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও, তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।"

এই সময়েই "প্রবাসী"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁহার প্রসিদ্ধ "গোরা" উপন্যাসেও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া এই গঠনমূলক স্বদেশসেবার আদর্শই তিনি ব্যক্ত করেন।

পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি সেই কথাটাই আরও স্পষ্টভাবে বলেন—

"দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কার্যের ভার এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীটিকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই স্বায়ত্ত সম্মেলনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজেদের পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে। সেখানে কার্য ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা বিবাদ ও মামলা মিটাইবে।"

পুনশ্চ—

"অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহাতে একত্র মিলিয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিলেও

আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে—কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই, তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।”

দেশের যুবকদিগকে এই গঠনমূলক কার্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

“তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও।.........এই কার্যে খ্যাতির আশা করিবে না; এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা, অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকুমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।”

দুঃখের বিষয়, দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁহার সেই নীরব কর্মসাধনার আহ্বানে তখন সাড়া দেন নাই; দিলে বাঙলা দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাকে এইরূপ গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিলে জাতি শক্তিমান হইত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আমরা অধিকতর প্রস্তুত হইতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। ফলে জোয়ারের জল যখন কমিয়া গেল, সাময়িক

উত্তেজনা যখন দূর হইল, তখন আমরা নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে অবসাদ ও জড়তা দেখা দিল, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনকে এখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

আয়র্লাণ্ডের জাতীয় আন্দোলনের নেতাগণ এই সত্যটি ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিকে যখন প্রবল 'সিনফিন' আন্দোলন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আর একদল লোক জর্জ রাসেল, স্যার হোরেস প্লাঙ্কেট প্রভৃতির নেতৃত্বে আয়র্লাণ্ডের গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কার্য করিতেছিলেন। ফলে আইরিশ-দের জাতীয় শক্তি কখনও দেউলিয়া হইয়া পড়ে নাই, পরবর্তী-কালে স্বাধীনতার সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধীও এই সত্য তাঁহার স্বচ্ছ দূরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই অসহযোগ আন্দোলন এবং তাহার পরবর্তী আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঠনমূলক কার্য করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এমন কি, ঐজন্য তিনি কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিয়াছেন। দেশের জনসাধারণের উপর তাঁহার অসীম প্রভাবের মূল উৎস ইহারই মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে সেই সব কথাই গঠনমূলক কর্মসাধনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। বর্তমানে যে জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী গঠনমূলক কার্যের কথা বিস্মৃত হন নাই, বরং উহাকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ পাবনা সম্মিলনীতে গঠনমূলক কার্যের ধারা নির্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু নিজে কয়েক বৎসর পর্যন্ত সে দিকে তেমন মনোনিবেশ করেন নাই। কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই তিনি ডুবিয়া গেলেন, ইউরোপে গিয়া বিশ্বসাহিত্য সমাজের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিলেন এবং "নোবেল পুরস্কার" লাভ করিলেন। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার গঠনমূলক স্বদেশ সেবার আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯১৪ সালে এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি "শ্রীনিকেতন" স্থাপন করিলেন। "শান্তি নিকেতন" পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টি হইতে লাগিল। বোধ হয় এই কারণে ১৯১৫ সালে 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী' (Bengal Social Service League) প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সভাপতিরূপে উহাতে যোগ দিলেন এবং নিজের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা করিলেন। 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী'র কার্যপ্রণালী তিনি নিজে নির্ধারিত করিয়া দেন। উহাতে ছিল—

(১) নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখানো। (২) ছোট ছোট ক্লাস ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। (৩) ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের

জন্য সমবেত চেষ্টা। (৪) শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন। (৫) গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। (৬) গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে উহার উপকারিতা প্রদর্শন। (৭) দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময়ে দুঃস্থদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গঠনমূলক স্বদেশ সেবাকে রূপ দিবার জন্য আর একটি যে মহৎ প্রচেষ্টা করেন, তাহার ইতিহাস দেশবাসীর নিকট বলিতে গেলে এতদিন অজ্ঞাতই ছিল। সম্প্রতি "শনিবারের চিঠি"র শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস উহাকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এই মহৎ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন শ্রীযুত অতুল সেন এবং তিনিই এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশ করিয়াছেন। অতুলবাবু পূর্বে ছিলেন বিপ্লবপন্থী এবং ঐ মতাবলম্বী একদল দৃঢ়চিত্ত কর্মী যুবকদের নেতা। কিন্তু এই সময়ে নানা কারণে তাঁহারা বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া কোনরূপ গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া স্বদেশ সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও এজন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যোগাযোগ ঘটিল, উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। অতুল-বাবু, স্বীয় দলবলসহ রবীন্দ্রনাথের কার্যপন্থা গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও সানন্দে তাঁহাদের হস্তে সেই ভার তুলিয়া দিলেন।

"শনিবারের চিঠি" এই স্মরণীয় ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কালিগ্রাম পরগণা ঠাকুরবাবুদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত—রাজসাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রাণীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদিঘী, নসরৎপুর ও তালোয়া—এই কয়টি রেল স্টেশনকে ঘিরিয়া এই পরগণা দৈর্ঘে প্রস্থে অনেক শত মাইল ব্যাপিয়া। অতুল সেন হইলেন প্রধান কর্মী, শ্রীযুত উপেন ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার সহকারী। সঙ্গে অতুলবাবুর কর্মিসংঘ। কবিনির্দ্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত পাঁচটি—(১) যথাযোগ্য চিকিৎসা বিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষা বিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস্ অর্থাৎ কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা ও (৫) সালিশী বিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

"প্রথম কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে—পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে, হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি 'বেডের'ও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সৎকার্যের ব্যয়ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও অংশত প্রজারা বহন করিতেন। খাজনার টাকা পিছু এক আনা তিনি দিতেন, প্রজারা এক আনা দিত।"

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অনুসারে দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়; রাত্রির ও দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু ও বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাবলিক ওয়ার্কস সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের সজাগ করিয়া কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কার্যে ব্যয় অত্যন্ত অধিক। পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত, জঙ্গল সাফ প্রত্যেকটি ব্যয়সাধ্য কাজ। কিন্তু অতুলবাবুর সুচিন্তিত স্কীম অনুসারে প্রজাদের নিকট হইতে কায়িক পরিশ্রম স্বরূপে চাঁদা লওয়া হইতে লাগিল, অর্থাৎ এই সকল কাজে তাহারা 'জন' খাটিতে লাগিল। এইরূপে মাত্র সাত আট মাসের মধ্যেই কালিগ্রাম পরগণায় বহু সহস্র টাকার কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল।

চতুর্থ উদ্দেশ্য, ঋণদায় হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার স্কীমটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের। পঞ্চম উদ্দেশ্য—সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা অতুলবাবুর নিকট উপস্থাপিত করা হইত। তিনি বিচার বুদ্ধিমত সুরাহা করিয়া দিতেন। এই কার্যে প্রজারা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

"স্বদেশী সমাজে" রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছিলেন,

পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, অতুলবাবু ও তাঁহার কর্মিসংঘের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রাম পরগণায় সেই সবই কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাজও বেশ ভাল চলিতেছিল। অতুলবাবু ও তাঁহার কর্মিসংঘের উৎসাহের অন্ত ছিল না। সর্বপ্রকার পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের জন্যই তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অতুলবাবুকে তিনি যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট। কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে বোধ হয় ক্রূর হাস্য করিতেছিলেন। এত বড় একটা মহৎ প্রচেষ্টা সফল হইতে চলিল, গ্রামবাসীরা শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে লাগিল, সরকারী গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের বোধ হয় কিছুতেই সে দৃশ্য সহ্য হইল না। অতুলবাবু ও তাঁহার দলবল পূর্ব হইতেই বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহভাজন ছিলেন। এই সন্দেহের সুযোগ লইয়া গোয়েন্দা পুলিস একদিন তাঁহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিল এবং সরকারী আদেশে তাঁহারা অন্তরীণ বা নজরবন্দী হইলেন। কালিগ্রাম পরগণায় প্রায় এক বৎসর কাজ চলিবার পর এই বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ইহাতে প্রবল আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। মাত্র তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য ও সংযম বলেই

তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। অতুলবাবু প্রভৃতি অন্তরীণ হইবার পর অতুলবাবুর পত্নীকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"কল্যাণীয়াষু,

তোমার স্বামীর অন্তরীণ সংবাদ আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। কি কারণে এই বিপত্তি ঘটিল তাহা কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তাহার কোন ফল হইবে কিনা বলা যায় না। তোমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ, ভগবান তোমাদের সেই দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করুন। এই কামনা করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করিবার নাই।"

এইরূপে কবির সকল উদ্যম আয়োজন ব্যর্থ হইল, কিন্তু ইহাতে তিনি নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। শান্তিনিকেতন বিশেষ করিয়া শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার পল্লীসংগঠন নীরব কর্মসাধনার আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিতে গেলে, ১৯১৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন লইয়াই ছিলেন। গ্রামের স্বাস্থ্য-সংস্কার, পল্লীশিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসার, লোকশিক্ষা বিস্তার, সমবায় সমিতি গঠন—এই সবই ছিল শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য। আমার স্বর্গীয় বন্ধু কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনের কর্ণধার এবং এই সব কাজে রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে এই পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে কত চিন্তা করিতেন, কালীমোহনবাবু বহুবার আমার নিকট তাহা বলিয়াছেন। কবির বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব এই পল্লীসংগঠন কার্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এজন্য তিনি বার্ষিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও করেন। উহার ফলে শ্রীনিকেতনের কাজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশা কিরূপ গভীরভাবে অনুভব করিতেন এবং পল্লীসংগঠনের কাজ কত বড় মনে করিতেন, কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার নিজের মুখ হইতেই সে বিষয়ে শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। একবার তিনি আমাকে বলেন,—"দেশের সবচেয়ে বড় দুর্গতি গ্রামবাসীদের এই ঘোর দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য। তাহারা কুকুর বিড়ালের মতো না খেয়ে মরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, এমন কি চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্রে এককোটা পানীয় জলও তাদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে ওঠে। যদি এই গ্রামবাসীদেরই বাঁচান না গেল, তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করা না গেল, তবে আর দেশোদ্ধারের বড় বড় কথা বলে লাভ কি?"

আর একবার কয়েকজন সাংবাদিক মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের বলেন,—"তোমরা বড় বড় রাজনীতির কথা লেখ, কিন্তু ও সবে আমার মন ভরে না। এই যে প্রতিদিন গ্রামবাসীদের দুঃখদারিদ্র্য চোখের সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এইটাই আমার

কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে হয়। তোমাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র সংবাদপত্র আছে, তোমরা সেই অস্ত্র এদের জন্য প্রয়োগ কর। দেশের লোককে জানাও এদের দুঃখ দুর্দশা কিরূপ অপরিমেয়, কি ভাবে সেই দুঃখ মোচন করতে হবে তার পথ দেখিয়ে দাও। তবেই তোমাদের সংবাদপত্রসেবা সার্থক হবে।"

শেষ জীবনে তাঁহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে তিনি শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া যে গঠনমূলক কাজ করিতেছেন, তাহার সম্যক পরিচয় দেশের লোক পায় নাই। উঁহা যাহাতে লোকে ভাল করিয়া জানিতে পারে, সেজন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি নিজে কালীমোহন-বাবুকে বলিয়া বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া শ্রীনিকেতনের কাজ আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। আর একবার 'রবিবাসর'-এর সাহিত্যিকমণ্ডলীর সদস্যদিগকে তিনি শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করেন। সদস্য হিসাবে আমিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ন্যায় দরিদ্র সাহিত্যিকদিগকে যেরূপ রাজোচিত অভ্যর্থনা করেন, তাহা জীবনে ভুলিব না। যে দিন 'উত্তরায়ণে' আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, সেদিনের দৃশ্য এখনও চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। বৃহৎ হলে আমরা সকলে খাইতে বসিয়াছি। মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ আতিথেয়তার প্রতিমূর্তি স্বরূপ বসিয়াছেন। পরিবেশন করিতেছেন কবির পুত্রবধূ, দৌহিত্রী ও পালিতা পৌত্রী।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের সরস গল্প ও হাস্য পরিহাস, অন্যদিকে নানাবিধ মনোরম খাদ্য—কোন্‌টি যে বেশী উপভোগ্য হইয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

কবি সে দিনও কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"লোকে মনে করে, আমি শুধু কল্পনাবিলাসী কবি। কিন্তু বাস্তব কার্যক্ষেত্রে আমি যে জিনিষ সারাজীবন ধরে গড়ে তুললাম, তার পরিচয় কেউ নিতে চায় না। তোমরা সব সাহিত্যিক, আমার এই গঠনমূলক কার্য যদি তোমরা নিজেরা দেখ এবং দেশের লোকের কাছে উহার কথা প্রচার কর, তা'হলে আমি আনন্দিত হব।"

কবি তাঁর এই অমরকীর্তি—শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী দেশবাসীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এগুলিকে রক্ষা করবার মহৎ দায়িত্ব এখন দেশবাসীর উপরেই পড়িয়াছে

৭

উপসংহার

১৯০৮ সালের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ কোন প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সেভাবে যোগ না দিলেও তিনি একেবারে উহার সংস্পর্শ এড়াইতে পারেন নাই। দেশের ও জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য যখনই তাঁহার সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কয়েকটি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন আহুত হয়, তাহাতে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের মধ্যে আবার বিবাদ বাধিয়া উঠে। চরমপন্থী বা নবীন জাতীয়তাবাদী দল প্রস্তাব করেন যে, মিসেস অ্যানি বেশান্তকে ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী করা হউক। মিসেস বেশান্ত তাহারই কিছু পূর্বে "হোমরুল আন্দোলন"-এর জন্য বিনা বিচারে অন্তরীণ হইয়াছিলেন। নরমপন্থী মডারেট দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মিসেস বেশান্তের সভাপতিত্বের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে চরমপন্থী বা নবীন জাতীয়তাবাদী দলের মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মৌলবী ফজলুল হক,

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের সঙ্গে মিসেস বেশান্তকেই সভানেত্রীরূপে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ লইয়া ঐরূপ মতদ্বৈধ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটগণ বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদে নির্বাচিত করিতে চাহেন। কিন্তু নবীন জাতীয়তাবাদী দল ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাহাতে সম্মত হইলেন। এইরূপে দুই দলে মতভেদ হইয়া উঠিল, তখন সৌভাগ্যক্রমে একটা আপোষের ব্যবস্থা হইল। মডারেট দল মিসেস অ্যানী বেশান্তকে সভানেত্রীরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথও শেষ মুহূর্তে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের অনুকূলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং "জাতীয় প্রার্থনা" পাঠ করেন।

তৎকালীন নবজাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মোৎসব উপলক্ষে 'পরিচয়' পত্রে এ সম্বন্ধে যে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা, অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইতেছে এবং ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত

হইতেছেন। নরম দল ও গরম দলের মধ্যে ইতিপূর্বেই মনোবাদ বাধিয়াছে—আমি গরম দলভুক্ত। আমরা চাই মিসেস বেশান্তকে সভানেত্রীর আসন দিতে—নরম দলের তাহাতে বিশেষ আপত্তি। Indian Association হলে সভা বসিয়াছে। বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতি (অভ্যর্থনা সমিতির) করিবার প্রস্তাব পেশ হইল। আমি উঠিয়া আপত্তি করিলাম। বলা উচিত তখন আমার ত 'দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা' ছিলই না (এখনও যে বিশেষ আছে একথা বলি না)—দ্বন্দ্বপ্রিয়তা যথেষ্ট ছিল। তাহার ফলে এবং গরমপন্থীর বন্ধুদের সহযোগিতায় মিটিং ভাঙ্গিয়া গেল। অবশ্য নরম দলেরা বিলক্ষণ চটিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক করিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকে ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করিলাম। তাঁহার মত নিরীহ লোকের এ বিবাদে না যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে এবং ভারত জননীর একান্ত সেবিকা মিসেস বেশান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথ 'মদরত'দিগের অশেষ অনুনয় উপেক্ষা করিয়া সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে আমাদের দল বেশ প্রবল হইয়া উঠিল এবং জনসাধারণ দলে দলে ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যভুক্ত হইল। অবস্থা বুঝিয়া 'মদরতে'রা মিসেস বেশান্তকে কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করিলেন। কাজেই সাময়িক বিবাদ মিটিয়া গেল। তখন রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন।" (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)।

১৯১৯ সালে রাউলেট আইনের প্রতিবাদে দেশময় তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ নববৎসরের দিন—অমৃতসরের জালিওয়ানাবাগে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষিত হয়। বহুলোক হতাহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রথমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। জননায়কগণও যেন কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এই নৃশংস ব্যাপারের প্রকাশ্যে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বড়লাটকে একখানি পত্র লিখিয়া জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গভর্মেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। এই পত্রে কবির লেখনী হইতে যে তেজোময়ী বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের পত্র যখন প্রকাশিত হইল, তখন দেশবাসী পাঞ্জাবে দমননীতির তাণ্ডব এবং জালিওয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা জানিতে পারিল। ফলে দেশের সর্বত্র ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জননায়কগণ পাঞ্জাবে গিয়া

সমবেত হইলেন এবং জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বড়লাটের নিকট যে প্রতিবাদ-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has with a rude shock revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India.

* * * *

Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organization for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification.

The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutory lessons.

* * * *

Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble

vision of statesmanship in our Government which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror.

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দিশালায় একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে। এই বন্দিশালায় বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দিগণ ছিলেন। একটা গোলযোগের ফলে প্রহরীদের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষ ঘটে, প্রহরীরা গুলী চালনা করে, ফলে দুইজন রাজনৈতিক বন্দী নিহত এবং অনেকে আহত হন। এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশময় প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। গুলী চালনার প্রতিবাদে কলিকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভার আয়োজন হয় এবং রবীন্দ্রনাথকেই সেই সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সে আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

কিন্তু সভায় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব হইতেই টাউন হলে এরূপ বিপুল জনসমাগম হইতে থাকে যে, সেখানে সভা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশেষে গড়ের মাঠে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের নীচে সভা করা হইল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে যে বক্তৃতা করেন বহু দিন তাঁহার কণ্ঠে সেরূপ তীব্র আবেগময় বক্তৃতা শুনি নাই। তিনি যেন সমগ্র বাঙালী জাতির ক্ষোভ ও মর্মবেদনাই তাঁহার অননুকরণীয় ভাষার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিতে পারেন নাই, বরং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান" নামে পর পর দুইটি বক্তৃতা করিয়া তিনি গান্ধীজীর অবলম্বিত পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৯৩২ সালে মহাত্মাজী যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে আমরণ অনশন বরণ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এইজন্য গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়া শান্তিনিকেতনে কয়েকটি বক্তৃতা করেন এবং পুণার যারবেদা জেলে গিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সম্মুখেই অনশন ভঙ্গ করেন।

ইহার পর মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার ফল দেশের পক্ষে ঘোর

অনিষ্টকর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশের নেতারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তথা কংগ্রেসের এই 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিবার জন্য যে বিরাট জনসভা হয়, রবীন্দ্রনাথই তাহার সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভাল ছিল না। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলেন, "আমাদের পক্ষে ইহার (বাঁটোয়ারার) অপমান এমন দুর্বিসহ যে, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য-হীনতার অজুহাত দেখাইতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম এবং আমার চিরপ্রিয় নির্জনতা পরিত্যাগ করিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে আসিলাম।"

সভায় এত বেশী ভীড় হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। বক্তৃতা করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ যাহাতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা তিনি করেন। বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে সেদিন তাঁহার কর্তব্য পালনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই, ইহা তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমেরই নিদর্শন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, গত কয়েক বৎসরে

তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্মেন্টের তথা আমাদের জননায়কগণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ঐ কথাগুলি এখনও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত এবং বাঁটোয়ারার রদ না করিলে দেশের যে কল্যাণ নাই,—রাজনৈতিক তথা সাম্প্রদায়িক শান্তি কখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহা উপলব্ধি করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের সেই সারগর্ভ অভিভাষণ হইতে তুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য একটা অভিশাপ। যে সকল দল ও সম্প্রদায় বাঁটোয়ারা চাহে নাই, তাহাদেরও উপর এই অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে রাজনীতি হিসাবে আঠারটা পৃথক ভাবে বিভক্ত করিবার আয়োজন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতবর্ষের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন শব মাত্রে পরিণত হইবে।......

মুসলমান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন,—

"আসুন, আমরা দূরদর্শিতা অবলম্বন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি যে, সাবধানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সুবিধা লাভ হয়, তাহা ভাগ্যবান অনুগৃহীত এবং তুর্ভাগ্য বিমুখ—উভয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিকর। তাহার ফলে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহা পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্‌কাইয়া দিবে এবং যাহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সস্তায় কিস্তীমাত করে,

পরিণামে তাহাদেরও কোন মঙ্গল হইবে না। আমরা, যাহারা এক জন্মভূমির সন্তান, সভ্য জাতিস্বরূপ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য, এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের উচিত পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষোভের কারণ ও প্রলোভন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া দেশ ও বিদেশের তাহাদিগকেই উপেক্ষা করা উচিত, যাহারা তাহাদের বন্ধুত্বের পথে কণ্টক স্থাপন করে।......

"এই অন্যায় অনুগ্রহের যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া আছে, তাহাই চিন্তার বিষয়; কারণ একদিন আসিবে যেদিন আর এইরূপ অনুগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, যে দিন এক তরফা আব্দার পালনে স্বেচ্ছাচারীরও চক্ষুলজ্জা হইবে; অথচ সেই দিনও অন্যায় অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না।"...

ব্রিটিশ শাসকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন,—

"যাঁহারা ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িক কালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা শিরে বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, ঐ অপমান প্রতিনিক্ষিপ্ত হয় এবং উহার বিষ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের আর একটা দিকের কিছু পরিচয় দিয়া আমরা এখন এই আলোচনা শেষ করিব।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম হইতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন। বাল্যে পিতার নিকট হইতে যে শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। উপনিষদের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাচীন ঋষিরা যে সব সার সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মতে উহাই ভারতের আত্মার শাশ্বত বাণী। ভারতের এই শাশ্বত বাণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তাঁহার গভীর পরিচয় ছিল, সেই সভ্যতার মধ্যে যে তেজস্কর সত্য আছে, তাহার প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি চিরদিনই তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য দিকে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের কথা দেশবাসী যাহাতে না ভুলে, সেই দিকেও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কেবল তাহাই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও মনে করিতেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে তাহার সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তা বর্তমান জগতের নিকট প্রচার করা কর্তব্য। কেননা তাহাতে বিশ্বমানবের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। জীবনের শেষ ভাগে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। এক কথায় তিনি হইয়াছিলেন আধুনিক জগতের নিকট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূত। আর এই দৌত্যকার্য তিনি এমন কৃতিত্বের সঙ্গে করেন যে, বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই দৌত্য কার্যের বিবরণ লিখিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থই লিখিতে হয়। হয়ত ভবিষ্যতে কোন যোগ্য লেখক সেই কর্তব্য পালন করিবেন। বন্ধুবর শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ "দেশভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ" নামক গ্রন্থে এই কর্তব্য কিয়দংশে পালন করিয়াছেন। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের সামান্য কিছু পরিচয় দিলাম।

১৯১২-১৩ খৃঃ—গ্রেটব্রিটেন, নিউইয়র্ক (উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা); সিকাগো (ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ)।

১৯১৬—জাপান, আমেরিকা।

১৯২০—ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ; আমেরিকা (নিউইয়র্ক, সিকাগো, টেকসাস)।

১৯২১—ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী (কবি এইবার জার্মানীর নানা স্থানে বক্তৃতা করেন ও বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন)।

১৯২৪—চীন, দক্ষিণ আমেরিকা। ১৯২৫ ও ১৯২৬—ইটালী, নরওয়ে, জার্মানী।

১৯২৭—সুমাত্রা, জাভা, বলী, মালাক্কা।

১৯২৯—কানাডা।

১৯৩০—ব্রিটেন (অক্সফোর্ড); রাশিয়া। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মনের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। রাশিয়া যে নূতন প্রণালীতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতেছে

তাহার মূল সূত্র আমাদের দেশে অনুসৃত হইলে জাতির কল্যাণ হইবে, এই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছিল। রাশিয়ার চিঠিতে একথা তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছিলেন।

১৯৩২—পারস্য ও ইরাক। ৭১ বৎসর বয়সে কবি বিমানযোগে এই দুই দেশ ভ্রমণ করেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ মানসিক বলেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক সভ্য জাতিদের ঘোর বর্ণবিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ও পররাজ্য-লোলুপতা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধ্বংস-কারী প্রবৃত্তি ও আত্মহত্যাকর নীতি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের অপরাহ্ণে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৬ সালেও মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উপর তিনি একেবারে বিশ্বাস হারান নাই। কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও বিশেষভাবে ইংরাজ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"এখনো মানবতার আদর্শের প্রতি পাশ্চাত্যের মজ্জাগত আকর্ষণ বিষয়ে আমার মনে দৃঢ় আস্থা বিদ্যমান। এইজন্যই আমাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে আমাদের গতিকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া ফেলিবার জন্য সুকৌশলী রাজনীতিকের দৃঢ় ফাঁদের বেষ্টন নিজেদের আশে পাশে যদিও অনুভব করিতে পারিতেছি, তথাপি আমি

পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার বাহক ও পোষক ইংরেজদের বীরসুলভ মানবতার দোহাই না দিয়া পারিতেছি না।”......

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আধুনিক সভ্য-জাতিদের তথা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রতি তাঁহার আস্থা একেবারেই লোপ পাইয়াছিল বলিলেই হয়। বিশেষত, বৃটিশসাম্রাজ্যবাদীরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরও পরাধীন ভারতের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার-পোষিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উৎস একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি গভীর উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিলেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তাঁহার শেষ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে ‘সভ্যতার সঙ্কট’ নামে দেশবাসীর নিকট তিনি যে বাণী প্রচার করেন, স্বদেশ, স্বজাতি ও বিশ্বমানবের কল্যাণ চিন্তায় তাহাই তাঁহার শেষ উক্তি। রবীন্দ্রনাথের গভীর দেশপ্রেম ও মানবপ্রীতির নিদর্শনরূপে ইহা চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এই অমর বাণী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ কদর্যমূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন :—“এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কি অপহরণ করেছে তা জানি। সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে

Law and Order—বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তি-রূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।”……

উপসংহারে গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে কবি বলেন—

“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে! জীবনের প্রথম আরম্ভে, সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম,

ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে, বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তার প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে—নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,—

অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

কবি তাঁহার এই শেষবাণীতে যে মর্মান্তিক সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন, নির্মম নিয়তির মতো তাহাই যে বর্তমান মানবসভ্যতার পরিণাম নির্দেশ করিতেছে সে বিষয়ে কে সন্দেহ করিবে!

বন্দে মাতরম্‌

পরিশিষ্ট

"স্বদেশী যুগে" বাংলা সাহিত্য

স্বদেশী যুগে বাংলা সাহিত্য জাতীয় আন্দোলনে যে প্রবল শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় আমার এই গ্রন্থে দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ যে এই কার্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আরও বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার প্রভৃতির দানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বদেশী যুগে সহস্র সহস্র কবিতা ও জাতীয়-সংগীত রচিত হইয়াছিল। সভাস্থলে, শোভাযাত্রায়, পথে ঘাটে, বাংলার ঘরে ঘরে এই সব সংগীত গান করা হইত। বাঙ্গালীর মনে জাতীয় ভাব উদ্বোধনে এই সব গান যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। (পুরাতন জাতীয় সংগীতের মধ্যে কবি মনমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন', এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান' গান দুইটাই বেশী গীত হইত।)

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য স্বদেশপ্রেমাত্মক সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, সরলা দেবী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' ও "আমার

জন্মভূমি" তাঁহার কবি-প্রতিভার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। কালীপ্রসন্ন কাব বিশারদের—

যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে—

এই গান গাহিয়া রাজপথে শত শত শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং অনেকস্থলে শোভাযাত্রাকারীরা অবিচলিতভাবে পুলিসের লাঠি-বৃষ্টি সহ্য করিয়াছিল। অতুল সেন ও রজনী সেনের স্বদেশী সংগীতের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের গান এখনও বাংলার সর্বত্র গীত হইয়া থাকে। কবি কামিনী ভট্টাচার্যের নাম এখন হয়ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী যুগে তাঁহার রচিত সংগীতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সরলা দেবীর 'নমো হিন্দুস্থান' বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমের সংগীত,—কংগ্রেস, কনফারেন্স, সভা, সমিতি সর্বত্র উহা গীত হইত, এখনও হইয়া থাকে।

স্বদেশী যুগে বহু নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। গিরিশচন্দ্র প্রথমে পৌরাণিক এবং পরে সামাজিক নাটক রচনাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশী যুগে তিনি নূতন রূপে দেখা দিলেন, তাঁহার রচিত 'সিরাজুদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি নাটক স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনে অশেষ কার্য করিল। বিশেষভাবে তাঁহার 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটক এক অপূর্ব সৃষ্টি, দেশবাসীর মনে এই নাটক যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

স্বদেশী যুগে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক। ইহাকে যুগপ্রবর্তক নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ যদি একখানি মাত্র নাটক লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি অমর হইয়া থাকিতেন। এই নাটক স্বদেশী যুগে রঙ্গমঞ্চে শত শত রজনীতে অভিনীত হইয়া দেশবাসীর মনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেকালে এই নাটক দেখিবার জন্য এত ভীড় হইত যে প্রতিদিনই স্থানাভাবে বহু দর্শককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত। এখনও এই নাটক সগৌরবে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া থাকে, ইহা কখনও 'পুরাতন' হইবে না। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'রঞ্জাবতী' প্রভৃতি নাটকও স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্যে নূতন ভাব ও রচনাভঙ্গী প্রবর্তন করেন। কবিতা ও হাসির গান রচনায় তিনি পূর্বেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে নাটকরচনাতেও তিনি অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিলেন। তীব্র স্বদেশানুরাগ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তাঁহার হাসির গানগুলির মধ্য দিয়াও এই স্বদেশপ্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার সেই স্বদেশপ্রেম জ্বালাময় গৈরিক স্রাবের মত নাটক ও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন', 'সিংহল বিজয়' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাবকে প্রবুদ্ধ করাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? দ্বিজেন্দ্রলালের সতেজ ওজস্বিনী ভাষা, বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গী, বাংলা ভাষাকে নূতন শক্তি দান করিয়াছিল, নাট্যসাহিত্যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারদের স্বদেশ প্রেমাত্মক নাটক অভিনয় করিয়া বাংলার নাট্যশালাগুলি যে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য বাঙ্গালীজাতি চিরদিন তাহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।